অক্টোবর ২০২৩ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

শেখ রাসেল

লাল-সবুজের

রাজপুত্তুর

সুমিত, দ্বিতীয় শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

আলভিনা চৌধুরী, প্রথম শ্রেণি, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনার স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। ১৯৬৪ সালের এই দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে শেখ রাসেলের জন্ম। ভাইবোনদের মধ্যে ছোট্ট রাসেল ছিল সবার আদরের। পড়তো ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ দিন শিশু শেখ রাসেলও ঘাতকদের নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি। শেখ রাসেলের জন্মদিনটি প্রতিবছর জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ বছর শেখ রাসেল দিবসের প্রতিপাদ্য–

শেখ রাসেল দীপ্তিময়
নির্ভীক নির্মল দুর্জয়

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে বিশ্ব। জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। শিশুদের সম্মানে বিশ্বে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার পালন করা হয় 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ'। আমাদের সরকারও শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিনে সকল শিশুদের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আমাদের কামনা কোনো শিশুর জন্মগত অধিকার যেন খর্ব না হয়। শিশুদের স্বপ্নের ভুবন হবে আলোয় ভরা, আনন্দে ভরা।
এতেই সফল হবে বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিন।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৩ শেখ রাসেল: লাল সবুজের রাজপুত্তুর/ আনজীর লিটন

১২ বিশ্ব শিশু দিবস ও বাংলাদেশের শিশুরা
খালেক বিন জয়েনউদদীন

৪৪ আমাদের দায়িত্বই শিশুদের অধিকার
মো. বেলায়েত হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৪০ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তফা মাসুদ

অনুবাদ গল্প

৩৮ বালু এবং পাথর/ সাইদুল হাসান

ছোটোদের ছড়া

১৫ মাশরুফা বিনতে নূর

২০ মিনহাজুল ইসলাম/ মুজাহিদুল ইসলাম
মো. তৌফিক আলম

সাফল্য প্রতিবেদন

৪৬ বিশ্বের অজানা সুন্দর প্রাণী/ মো. রফিকুল ইসলাম

৪৯ শিশুর বিকাশে গাছ/ মেজাউল হক

৫০ সপ্তয়ী পাখি/ শাহানা আফরোজ

৫১ টিম অ্যাটলাসের স্বর্ণপদক/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

৫২ শান্তির বার্তা নিয়ে ৫২ বিদেশি বাংলাদেশে/ নাজমুল কবীর

৫৩ শিশু-কিশোরদের বাতজ্বর/ মো. জামাল উদ্দিন

৫৫ ঘড়ির কাঁটা উলটো ঘোরা গ্রাম/ সাইফুল ইসলাম

৫৬ জাতীয় কন্যা শিশু দিবস/ জান্নাতে রোজী

৫৮ দশ দিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি

৬০ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

০৭ সাইকেল ও শেখ রাসেল/ আমীরুল ইসলাম

১৬ বইয়ের বদলে মাঠ/ সুজন বড়ুয়া

২১ শেখ রাসেলের নিঃসঙ্গ দিন/ রফিকুর রশীদ

২৬ পুঁচকে গাধার স্বপ্ন/ সৈয়দ মনজুর কবির

৩০ স্বপ্ন সেতু/ নাজমুল হুদা

৩৬ প্রেরণা ও সূর্যমুখীর গল্প/ শিবুকান্তি দাশ

কবিতাগুচ্ছ

১১ নকুল শর্ম্মা/ ইমরুল ইউসুফ

১৯ সারমিন ইসলাম রত্না/ নূরে আলম সিদ্দিকী শান্ত

২৫ রোকসানা গুলশান/ আতিক রহমান

৩৪ মিজানুর রহমান গ্রামসি/ রানাকুমার সিংহ
মো. কামরুজ্জামান

৩৫ শাহীনুর রহমান রিয়াদ/ জিশান মাহমুদ/ সালাম ফারুক

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সুমিত/ আলভিনা চৌধুরী

শেষ প্রচ্ছদ : সায়েমা আঞ্জুম বিভা

৫৪ কাজী আসির আবরার সত্য

৫৭ নাফিসা তাসনিম স্নেহা

৬২ রাফিন আল রাজী/ নাভিন আল রাজী

৬৩ নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার/ মুয়াজ আজিজ

৬৪ ইরাম ইনায়া/ মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

শেখ রাসেল
লাল-সবুজের রাজপুত্তুর

আনজীর লিটন

শেখ রাসেল। লাল-সবুজের রাজপুত্তুর। শিশুদের ভুবনে চাঁদের কণা। মাত্র ১০ বছর ১০ মাসের জীবন তার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। ছোট্ট এক জীবনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বপ্নকে আপন করতে শিখেছিল মাত্র। দু'চোখ মেলে দেখতে চেয়েছিল পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য।

বঙ্গবন্ধুর কাছে শেখ রাসেল ছিল বাংলাদেশের সব শিশুর প্রতীক। জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে প্রায়ই বঙ্গবন্ধু বার্ট্রান্ড রাসেলের গল্প শোনাতেন।

শেখ রাসেলের জন্ম মুহূর্তটি উজ্জ্বল আলো এনে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর পরিবারে। সে সময়টা ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। বাড়িতে এসেছেন ডাক্তার, নার্স। নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার জন্য সেদিন অধীর অপেক্ষা নিয়ে ঘুমঘুম চোখে জেগে ছিলেন ভাইবোনেরা।

মেজো ফুফু এসে খবর দিলেন, ভাই হয়েছে। খুশিতে সবাই আত্মহারা। বড়ো ফুফু ফুটফুটে চাঁদের কণা শিশুটিকে প্রথম তুলে দিলেন ওর বড়ো আপুর কোলে। মাথা ভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনদর্শন বঙ্গমাতাকে এতটাই আকৃষ্ট করল যে, পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া নতুন শিশুটির নাম রাখা হলো শেখ রাসেল।

জন্মের পর থেকেই বাবার সঙ্গে শেখ রাসেলের দেখা হতো কম। কারণ বাবার বেশির ভাগ সময় কেটেছে কারাগারে। মা ও বড়ো ভাইবোনদের কোলে চড়েই কেটেছে শৈশবের দুরন্তপনা মুহূর্তগুলো। রাজনৈতিক পরিবেশ ও নানা সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে শেখ রাসেলকেও।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দীর্ঘ নয় মাস, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে মা ও বড়ো বোনদের সঙ্গে তাকেও বন্দি জীবন কাটাতে হয়। বড়ো দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল তখন রণাঙ্গনে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিলেন।

আমাদের প্রিয় ছোটো ভাই রাসেলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' গ্রন্থে লিখেছেন–

> 'রাসেল আব্বাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। আব্বাকে মোটেই ছাড়তে চাইত না। যেখানে যেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব আব্বা ওকে নিয়ে যেতেন। মা ওর জন্য প্রিন্স স্যুট বানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ আব্বা প্রিন্স স্যুট যেদিন পরতেন সেদিন রাসেলও পরত। কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই তার নিজের পছন্দ ছিল। তবে একবার একটা জিনিস পছন্দ হলে তা আর ছাড়তে চাইত না। ওর নিজের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। নিজের পছন্দের ওপর খুব আস্থা ছিল। খুব স্বাধীন মত নিয়ে চলতে চাইত। ছোট মানুষটার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে অবাক হতে হত। বড় হলে সে যে বিশেষ একটা মানুষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।'

আমরা দেখতে পাই বাঙালি ইতিহাসের এই মহানায়কের আঙুল ছুঁয়ে পায়ে পায়ে হাঁটছে শিশু রাসেল। তাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ছুটছেন বাংলার নানা প্রান্তরে, কথা বলছেন আপামর জনতার সঙ্গে। প্লেনে

চড়ে গিয়েছেন বিদেশের রাজসভায়; সঙ্গে রাসেল। এটিই প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে শিশুর জন্য কী মায়াময় জায়গা ছড়িয়ে আছে। নিজের কনিষ্ঠ পুত্র বলে নয়, রাসেলকে সঙ্গী করে বঙ্গবন্ধুর কার্যত শিশুর জগৎ তৈরি করে দেবার বাসনা পোষণ করেছেন। জনতার কোলাহলের মাঝে বেড়ে ওঠার শক্তি যোগাতে চেয়েছেন। রাসেলের মধ্য দিয়ে এ দেশের শিশুদের সঙ্গে ভালোর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানান অনুষঙ্গ শেখ রাসেলের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলত। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' গ্রন্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন–

> 'আব্বা যখন ৬-দফা দিলেন তারপরই তিনি গ্রেফতার হয়ে গেলেন। রাসেলের মুখে হাসিও মুছে গেল। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে রাসেল আব্বাকে খুঁজত। রাসেল যখন কেবল হাঁটতে শিখেছে, আধো আধো কথা বলতে শিখেছে, আব্বা তখনই বন্দি হয়ে গেলেন। মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আব্বার মামলা-মোকদ্দমা সামলাতে, পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। সংগঠনকে সক্রিয় রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতেও সময় দিতে হত।'

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা তাঁর ছোটো ভাই সম্পর্কে লিখেছেন– শেখ রাসেল আমাদের ভালোবাসা। তাঁর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

> 'আব্বার সঙ্গে আমার ও রাসেলের জাপান, মস্কো ও লন্ডন বেড়াবার সুযোগ হয়। রাষ্ট্রীয় সফর বলেই রাসেল বিদেশিদের সাথে খুব সৌজন্যমূলক ব্যবহার করত। সে ছোট্ট হলেও বুঝতে পারত কোথায় কিভাবে চলতে শিখতে হবে। ঢাকায় ফিরে আমি যখন মা ও সবার কাছে ওর এই সুন্দর ব্যবহারের গল্প করেছি তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। লন্ডনে বিখ্যাত মাদাম

তুসো'র মিউজিয়ামে আমরা যখন বেড়াতে যাই রাসেলের বিস্ময় আর কাটে না। আমরা দুইজন আব্বার সাথে নাটোরের উত্তরা গণভবনেও গিয়েছি। রাসেল সেখানে মাছ ধরত, আমরা বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। ঢাকার গণভবনেও রাসেল মাছদের খাবার খাওয়াত। ফুফাতো ভাই আরিফ তার খুব ভালো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তারা দুইজন একই স্কুলে পড়ত এবং একসঙ্গে খেলত। টুঙ্গিপাড়ায় তাদের একটা খুদে বাহিনী ছিল, যাদের সঙ্গে খালের পানিতে সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলায় মেতে থাকত তারা।'

ভবিষ্যৎ সাধক হিসেবে বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে হলে শিশুদেরও গড়তে হবে। ওদের ভেতরে জাগাতে হবে দেশপ্রেম। শিশুরা গড়ে উঠুক কল্যাণকামী ও সৌন্দর্যমূলক জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। এমন সব দর্শনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে শেখ রাসেল হয়ে ওঠে তাঁর আদরের পরশমণি।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতায় লাল-সবুজের পতাকাসহ যেখানে ছড়িয়ে আছে বীর বাঙালির ইতিহাস সেখানেই রাসেল। রাসেল আজ শোকগাথার এক অনন্য চরিত্র। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র রাসেল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়াকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন–

'রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধুর কলিজার টুকরা। তিনি রাসেলকে এ দেশের সমস্ত শিশুর মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিটি শিশুই তাঁর পিতা-মাতার কাছে বড়ো আদরের। এখানে জাত-পাত, ধনী-গরিবের ভেদাভেদ নেই। আমাদের নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটাকে ভালো করে গড়তে হলে এই শিশুদের সঠিকভাবে গড়তে হবে। ওদের তাজা রক্তে দেশপ্রেম ঢুকাতে হবে। ওদের ভালোমতো গড়তে পারলেই আমি সার্থক।'

বাবার বুকের গভীরে মুখ রেখে সাহস আর বীরত্বের অনুভব নিয়েছিল শেখ রাসেল। তারও স্বপ্ন ছিল বড়ো হওয়ার। পড়ত ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে।

শেখ রাসেলের ইচ্ছে ছিল শৈশবের দুরন্তপনায় উড়ে বেড়াতে, ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু নরপিশাচদের বুলেটের আঘাত শেখ রাসেলের স্বপ্নময় জীবনটাকে স্তব্ধ করে দিল।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। বাবা-মা, ভাই-ভাবিদের রক্তের সঙ্গে মিশেছে তার নিথর দেহ। মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল রাসেল। নরপিশাচ ঘাতকের দল দেয়নি। শেখ রাসেলের কথা শোনেনি। তাকে বাঁচতে দেয়নি।

দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় কত সংগ্রাম, কত রক্তস্রোত, কত বেদনা, জেল-জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন সইতে সইতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রচিত হলো এদেশের বিজয়। বিজয়ের এই গৌরব আপামর জনতার সঙ্গে শিশুরাও অনুভব করছে। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে যে সাহস আর সংগ্রামের ঝাঁঝালো প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে, সেখানে এ দেশের শিশুরাও গৌরবের প্রতীক হয়ে মিশে আছে।

শেখ রাসেলের কথা বারবার উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ে। রাসেলের জন্য তাঁর অন্তরকাঁদা আর্তনাদ শিশুর প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। শেখ রাসেলকেও প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে। কিন্তু তারও ইচ্ছে ছিল শৈশবের দুরন্তপনা নিয়ে উড়ে বেড়াতে, ঘুরে বেড়াতে। তারও স্বপ্ন ছিল বড়ো হওয়ার। কিন্তু সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। ঝরে গেল বাগানের নিষ্পাপ কুঁড়ি। কেমন করে আমরা ভুলি শেখ রাসেলকে? এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, লাল-সবুজের পতাকাসহ যেখানে-যেখানে ছড়িয়ে আছে বীর বাঙালির ইতিহাস, সেখানেই শেখ রাসেল। লাল-সবুজের রাজপুত্তুর শেখ রাসেল আমাদের কাছে আজ শোকগাথার এক কবিতার ভুবন। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

গল্প

সাইকেল ও শেখ রাসেল

আমীরুল ইসলাম

আমি থাকি আজিমপুরে। ছাপড়া মসজিদের পাশে। পড়ি লিটল এনজেল্‌স স্কুলে, আমার মা সরকারি চাকরি করেন। আমার বাবার নিউমার্কেটে দোকান আছে। তিনি ব্যাবসা করেন।

আমার নাম পাভেল। ক্লাস ফাইভে পড়ি আমি। মা অনেক স্বপ্ন দেখে আমাকে নিয়ে। আমাকে আঁকিয়ে বানাবে, আমাকে গায়ক বানাবে, আমাকে খেলোয়াড় বানাবে, টিচার বানাবে। নানা রকম স্বপ্নের ডালপালা।

শিশু একাডেমিতে ছবি আঁকার ক্লাসে যাই একদিন। শুক্রবার সকালে। বৃহস্পতিবার বিকালে ত্রিতাল শিল্পীগোষ্ঠী ক্লাসে যাই। ক্লাস হয় আমাদের স্কুলেই। বাসায় তিনজন টিচার আসেন। মিস পড়ান অঙ্ক আর ইংরেজি। সাদেক স্যার বাকি সাবজেক্ট। আর সপ্তাহে দুইদিন বিকালে হুজুর আসেন। তাঁর কাছে পড়ি আরবি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কোরানশরিফ পড়া ধরব।

আমার খুব ব্যস্ত জীবন। আমার রিনি খালা পড়েন হোম ইকোনোমিক্সে। আমার নানার বাড়ি লালবাগ। খালার সঙ্গে আমার অন্যরকম ভালোবাসা।

খালার সঙ্গে দেখা হলেই আমার মন আনন্দে নেচে ওঠে। খালা অনেক গল্প জানেন। কাঞ্চনমালা, লালপরি-নীলপরি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুওরানি-দুওরানির গল্প, সিন্দাবাদের অভিযান সবই আমি রিনি খালার কাছে জেনেছি।

খালা আমাকে একটা ট্যাব কিনে দিয়েছেন। আমি সময় পেলেই ট্যাবে অনেক গেমস খেলি। কখনো হাসির কাহিনি দেখি। পাবজি, ক্র্যাশ অব ল্যান্ড, এ্যাংরি বার্ড, কল অফ ডিউটি–আমার খুব মজা লাগে।

ট্যাবে আমি অনেক সময় গাড়ির ছবি দেখি। প্লেন চালাই, জাহাজ চালাই। কখনো ফুটবল খেলি। গান শুনি। রিনি খালা একদিন বললেন, সারাদিন তুমি ট্যাবে চোখ রাখো। খুব ভালো কথা। কিন্তু আরও অনেক কিছু জানার আছে। দেশ আর দেশের মানুষ সম্পর্কে যদি কিছু জানতে না পারো তবে তো কিছুই জানা হবে না। আমি খালার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি।

রিনি খালার সবকিছু কি আর আমি বুঝতে পারি।

খালা কলেজে পড়ার সময় নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছে। টিয়ার গ্যাস খেয়েছে। গুলির মুখে কোনো রকমে বেঁচে গেছেন। অন্যরকম তিনি।

দুই

রিনি খালা একদিন আমাকে শিশু একাডেমি নিয়ে গেলেন।

শুক্রবার বিকেল।

শীতের দিন। ছায়া ছায়া রোদ। আমাকে নিয়ে বিখ্যাত হাশেম খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন,

উনি খুব বিখ্যাত শিল্পী। তোমাদের জন্য ছবি আঁকেন। হাজার হাজার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তিনি।

আমি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। খালা আরও বলেন,

আমরা ছোটোবেলায় হাশেম স্যারের ছবি দেখে বড়ো হয়েছি। আমাদের পাঠ্যবইতে তাঁর আঁকা ছবি থাকত।

হাশেম খান মিষ্টি হাসি দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে আদর মাখা কণ্ঠে বললেন,

কী নাম তোমার? কোন ক্লাসে পড়ো?

পাভেল। ক্লাস ফাইভে পড়ি।

বাহ্ সুন্দর নাম, একটা বিখ্যাত বইতে এই নামে একটা চরিত্র আছে। জানো তুমি?

আমি রিনি খালার মুখের দিকে তাকালাম। মাথা ঝাঁকালাম। বললাম,

আমার নাম পাভেল। 'মা' উপন্যাসে এই নামের একজন আছে।

শাবাশ!

হাশেম খান খুব খুশি হলেন। আমি শিশু একাডেমির আর্ট ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে আমাদের ছবি আঁকা শেখান আবদুল মান্নান, ফরিদা জামান আরও অনেকে।

আমরা দেশের ছবি আঁকা শিখতে লাগলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,মুক্তিযুদ্ধের ছবি, ৭ই মার্চের ছবি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর, ২১শে ফেব্রুয়ারি, বঙ্গবন্ধু এইসব ছবি। বিশেষ দিনে আমরা ছবি আঁকি। শিশু একাডেমির অনুষ্ঠানে অংশ নিই। লাল-সবুজ জামা পরে শিশু একাডেমির মাঠে ছুটোছুটি করি।

একবার ১৭ই মার্চে আমার আঁকা ছবি পুরস্কার পেল। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। আমি ছবি এঁকেছিলাম একটু অন্য ধরনের। অনেকগুলো টোকাই শিশুর ভিড়ে বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শিশুরা তাঁর চারপাশে।

একজন শিশুর হাতে বাংলাদেশের পতাকা, কারো

হাতে প্ল্যাকার্ড। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডে স্লোগান লেখা আছে। যেমন: আমরা সুন্দর হবো। শিশু অধিকারের বাস্তবায়ন চাই।

একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা আছে : এক নেতা এক দেশ। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। আর একটা ব্যানার : আমরা সবাই রাসেল হবো।

ছবিটা দেখে সবাই খুব খুশি। আমি পেলাম তৃতীয় পুরস্কার। হাশেম খানের হাত থেকে পুরস্কার পেলাম। হাশেম খান আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, তোমার ছবিটা সুন্দর হয়েছে।

আমি বুঝতে পারলাম হাশেম স্যারের মনে নেই আমাকে!

রিনি খালার সাথে বাসায় ফিরি। সেদিন রাতে রিনি খালার বাসায় থাকব। খালা আমাকে নিয়ে গেলেন। খালা আমার জন্যে রান্না করেছেন।

রাতে খাবার টেবিলে বসে খালা বললেন,

একদিন তুই বড়ো আর্টিস্ট হবি। ছবি আঁকাটা ছাড়বি না বাবা। আর দেশের ছবি আঁকবি। বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকবি, মানুষের ছবি আঁকবি।

আমি রিনি খালার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আর মনে মনে ভাবি, একদিন আমি ছবি আঁকিয়ে হবই।

তিন

একটা ছবি আমি খুব চেষ্টা করেও পুরোটা এঁকে উঠতে পারিনি। মাঝেমধ্যেই ছবিটা আঁকার চেষ্টা করি।

বঙ্গবন্ধুর ছবি। সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি। কালো পুরু ফ্রেমের চশমা। কালো মুজিবকোট। আর সামনে লক্ষ জনতার ভিড়। বঙ্গবন্ধু আঙুল উঁচু করে আছেন। ছবিটা আমাকে আঁকতেই হবে। রং দেবো না এই ছবিতে। সাদা-কালো ছবি।

খালা শুনে বলেন,

খুব ভালো হবে। বড়ো করে আঁকবি। আমি ড্রইংরুমে ফ্রেম করে রাখব।

ছবিটা আঁকার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই ছবিটা ফুটে ওঠে না। ছবিতে সেই গর্জন শুনতে পাই না।

ভায়েরা আমার...। অকুতোভয় সাহসী, বাঙালি বীর তিনি। তিনি শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেছেন। জেল-জুলুম ভয় পাননি। সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকেছেন। আপোশহীন নেতা তিনি। আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর ছবি আমাদের হৃদয়ে থাকে। হৃদয়ের ছবি আঁকা সহজ নয়। খালা বলেন একদিন আমি নাকি বড়ো শিল্পী হব। হয়ত সেদিন বঙ্গবন্ধুর ছবিটা আমি সত্যি সত্যি এঁকে ফেলব।

স্কুলে আমাদের ড্রইং শেখান আবদুর রব স্যার। উনি লাল কলম দিয়ে লেখালেখি করেন। সাদা খাতায় লাল রং দিয়ে ছবি এঁকে দেন। অথবা ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক দিয়ে ছবি এঁকে দেন। আমরা সেটা নকল করি। ছাতা, আম, ঘর, ফুল এইসব নানা কিছু আঁকা শিখি আমরা।

কিন্তু আমার মন মানে না। আম-ছাতা এসব এঁকে কী হবে? যা আঁকব তা মনের কথা। যা আঁকব– তা হৃদয় দিয়ে আঁকব। ভালোবাসা দিয়ে আঁকব।

চার

সেদিন বিকেলে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে রোদের ঝিকিমিকি। লাল-সবুজ পোশাক পরা ভাইবোনদের কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে চারদিক। কেউ ছবি আঁকছে, কেউ গান গাইছে। কেউ ছড়া পড়ছে। কেউ কেউ গল্প করছে।

আমি মতিউর মঞ্চের পাশে বসে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। ফরিদা আপা আমাদের ছবি আঁকার ক্লাস নিচ্ছেন।

আমার ছবির পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কী ছবি আঁকছ তুমি?

সাইকেলের ছবি।

সাইকেলে কে বসে আছে?

ওর নাম রাসেল।

রাসেলকে তুমি চিনো?

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

হ্যাঁ। চিনি।

কীভাবে চিনলে তাঁকে?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ছবি আঁকায় মন দিলাম। ফরিদা আপা বললেন,

বাহ– খুব সুন্দর ছবি।

হাশেম খান বললেন,

কী আঁকছ তুমি?

শেখ রাসেলের ছবি।

কেমন ছবি?

ওই যে, রাসেল ভাইয়া সাইকেল চালাচ্ছে। ছোট্ট একটা সাইকেল।

খুব ভালো। খুব ভালো।

স্যারের কথা শুনে আমিও খুব খুশি।

শেখ রাসেলের ছবি এঁকে আমি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবো। কারণ রাসেল আমার ভাই।

ছবিটা অনেক যত্ন করে আঁকতে চেষ্টা করি। কিন্তু ছবিটা সম্পূর্ণ হয় না। ছবিটা অসমাপ্ত থেকে যায়।

কেন?

জানি না আমি। ❑

শিশুসাহিত্যিক

জাতিপুত্র রাসেল

ইমরুল ইউসুফ

চুল উড়িয়ে বীরের বেশে সবুজ ঘাসে হাঁটো
ঘাসের মধ্যে লম্বা কিছু আবার কিছু খাটো
ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির ফুলে মধুর ঘ্রাণ
সবুজ ছুঁয়ে রাসেল সোনার যায় জুড়িয়ে প্রাণ
ইচ্ছে ডানায় দিচ্ছে পাড়ি টুংটাং সাইকেলে
বত্রিশ নম্বর লেকের ধারে খেলার সাথি মেলে
সন্ধ্যা নামে গাছগাছালি পাখপাখালির ডানায়
রাসেল ছাড়া জাতির পিতার বাড়িটি কি মানায়?
তাই তো রাসেল চোখের মণি ভাই-বোন মা-বাবার
এক টেবিলে নাশতা করে ভাগ করে খায় খাবার
ইশকুলে তার বন্ধু অনেক দিন কেটে যায় খেলে
জাতিপুত্র রাসেল সোনা বিস্ময়কর এক ছেলে
এই ছেলেকে মারল ঘাতক ঘৃণায় দেই গালি
পনেরোই আগস্ট দিনটিতে তাই কনক প্রদীপ জ্বালি।

ছোট্ট রাসেল

নকুল শর্ম্মা

চাঁদের কণা ছোট্ট রাসেল
জন্ম টুঙ্গিপাড়ায়,
সবার আদর গায়ে মেখে
মায়ের চোখে হারায়।

পরিবারের নয়নমণি
মুখে মিষ্টি হাসি,
রাখালিয়া মধুর সুরে
বাজায় যেন বাঁশি।

মনের সুখে আঁক তো বুকে
বাংলাদেশের ছবি,
স্বপ্ন ছিল হাজার তারার
হারিয়ে গেল সবই।

আগস্ট মাসের কালরাতে
নরপশুর হাতে,
ছোট্ট প্রাণটি শহিদ হলো
পরিবারের সাথে।

থেমে গেল নিষ্পাপ হাসি
অসমাপ্ত বেলায়,
ঝরে পড়ল রক্ত গোলাপ
নিষ্ঠুরতার খেলায়।

বিশ্ব শিশু দিবস ও বাংলাদেশের শিশুরা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

শিশুরা স্বর্গের দূত ও ফুলবাগানের প্রজাপতি এবং মানব প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। মানবসভ্যতার ধারক, বাহক ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কর্ণধার। কিন্তু সেই শিশুদের জন্মের পর থেকেই অকালে নানা কারণে ঝরে পড়তে হয়। ফুল ফোটার আগেই তাদের আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক, মানবসৃষ্ট যুদ্ধ ও অকালে শিশুদের প্রাণ হারাতে হয়। আর যারা বেঁচে থাকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। শৈশব ও কৈশোরের স্বপ্নগুলো বিনাশ করা হয়। মা-বাবা বা অভিভাবকদের কাছ থেকে হরণ করে শিশুদের পাচারও করা হয়। কারণ শিশুরা অবোধ। মনুষ্য সমাজের কূটকৌশল তারা বোঝে না। গোটা বিশ্বের শিশু সমাজের সেই আদি থেকে বর্তমান সময় অবধি এই হচ্ছে চালচিত্র।

বিশ্ব শিশু দিবস শিশুদের জন্য আনন্দের দিন। এদিন উল্লিখিত অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শিশুদের অধিকার রক্ষা, বিকাশ ও বেঁচে থাকার স্বপ্নকে লালন করার কথা বলা হয় এবং শিশুদের সকল প্রকার বিষয়সমূহ প্রচার-প্রচারণায় জানান দিতে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। বিশ্ব শিশু দিবস তাই অন্য দিনের থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

জাতিসংঘের আহ্বানে সারা বিশ্বে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব শিশু দিবস পালনের একটি ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের বিবেকবান মানুষ শিশুমৃত্যু রোধে প্রথম সোচ্চার হন। তারা শিশুর স্বাচ্ছন্দ্যে বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একটি নীতিমালাও তৈরি করা হয়, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পরে ১৯৫৪ সালে এই নীতিমালার সূত্র ধরে শিশুপ্রেমী মানুষরা শিশুর অধিকার সম্পর্কে আবার সোচ্চার হন এবং তারা জাতিসংঘের জেনেভায় সাধারণ অধিবেশনে শিশুর অধিকার সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তা কার্যকর করতে সময় লাগে ৪৫ বছর। অবশেষে সেই শিশু অধিকারসমূহ ১৯৮৯ সালে 'শিশু অধিকার সনদ' নামে জাতিসংঘে গৃহীত হয়। সনদে স্বাক্ষর করে মানবতাবাদী রাষ্ট্রসমূহ। গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। সেই থেকে বিশ্ব শিশু দিবসের সূত্রপাত।

আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হবার অনেক পূর্বে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু আইন-১৯৭৪ প্রবর্তন করেন। যা সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সংযোজিত। পরে তৈরি করা হয় জাতীয় শিশুনীতি, বাংলাদেশের শিশুদের সুরক্ষা কবচ।

কিন্তু জাতিসংঘের শিশু সনদ কিংবা আমাদের নীতিমালা কী সুরক্ষা দিতে পেরেছে? জাপান, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, প্যালেস্টাইন অর্থাৎ সেখানেই যুদ্ধ, সেখাইেন সবার আগে শিশু হত্যা, অস্বাভাবিক মৃত্যু। সাম্রাজ্যবাদী আক্রোশে আজও বিশ্বের শিশুরা নিপীড়িত ও নির্যাতিত। জাতিসংঘের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো সনদের তোয়াক্কা করে না।

আমরা ১৯৭১-এ দেখেছি পাকি সৈন্যের শিশু হত্যার চিত্র। তারা অকাতরে ৬-৭ লাখ বাঙালির সন্তান শিশু-কিশোর ভাইবোনদের হত্যা করেছে। নরাধম পাকি হত্যাকারীদের বিচার হয়নি। অথচ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হত্যা করেছে তারা। অনুরূপভাবে ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট সেই পাকি প্রেতাত্মারা বড়োদের সাথে রাসেল, নাসিমা, বেবী, সুকান্ত বাবু, আরিফ ও রিন্টুদের হত্যা করে। ইতিহাসে এই শিশু হত্যার নজির বিরল।

আমাদের দেশে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে। শুরু হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর, শেষ হয় অক্টোবরের প্রথম সোমবার মূল দিবস পালনের মাধ্যমে। ৩০শে সেপ্টেম্বর কিন্তু কন্যা দিবসও।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় আট কোটি শিশু-কিশোর। এসব শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও অধিকার আদায়ে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদের জন্য রয়েছে আলাদা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান, শিশু সংগঠন ও সমাজ কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। রয়েছে বিনা বেতনের শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার উপকরণ, বিদ্যালয়ে টিফিন ও বৃত্তির ব্যবস্থা। আরো রয়েছে খেলার মাঠ, পার্ক ও প্রচার মাধ্যমসমূহে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশের শিশুরা এখন আর পিছিয়ে নেই। তাদের অনেকের সুনাম বিদেশেও।

অনেকেই আমরা জানি না জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) প্রতি বছর গোটা বিশ্বের শিশুদের বিবরণ দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকাতে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথাও বলা হয়। বিশেষ করে আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত ও সর্বহারা শিশুদের চিত্র দেখে আমরা হতবাক হই। এক সময় বাংলাদেশের শিশুরা পাচার

হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে উটের শখের জকি হতো। বর্তমানে এটি হতে দেখা যায় না। তবে শিশু পাচার আজও রয়েছে।

অক্টোবর শিশু অধিকার আদায়ের মাস। বিশ্ব শিশু দিবস পালনের মাস। এ মাসের গুরুত্ব অন্য একটি কারণে বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। এ মাসের প্রথম সোমবারের তারিখটিও ১৮ই অক্টোবরের মতো বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ১৮ই অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস'। এদিন জাতির পিতার কনিষ্ঠপুত্র রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। অকালে তাকে মানুষরূপী নরাধমদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। এদিন তাকে স্মরণ করা হয়। শিশু হত্যাকারীদের ঘৃণা জানানো হয়।

শিশুদের কোনো বর্ণ-জাত নেই। তারা মানবজাতির সেরা সম্পদ। এজন্যই বলা হয়েছে শিশুরা স্বর্গের দূত ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তাদের অধিকার যারা খর্ব করে, তারা মানবজাতির শত্রু। এই শত্রুদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের আরো সোচ্চার হতে হবে। শিশুরা শৈশব-কৈশোরে একটি স্বপ্নের জগৎ কল্পনা করে বড়ো হয়। সেই স্বপ্নের জগতে যারা হানা দেয়, তারা অমানুষ। এদেরকে আমাদের রুখতে হবে।

একটি বিষয় আমাদের জানা উচিত-অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালনের দিন নির্ধারিত থাকলেও বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ অন্য মাসে পালন করে। যেমন– জার্মানি-সেপ্টেম্বর, মিশর-জানুয়ারি, জাপান-মে, ঘানা-নভেম্বর ও যুক্তরাজ্য-জুন মাসের নির্ধারিত একটি দিনে।

আর আন্তর্জাতিক সিমিয়া সংগঠনের দেশগুলো বিশ্ব শিশু দিবসকে Universal Children day এর পরিবর্তে বলে International day, তারা বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে ১লা জুন।

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বেশ ক'বছর আগে স্পেনের মাদ্রিদ থেকে একটি পোস্টার প্রকাশিত হয়। পোস্টারের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শিশু সম্পর্কিত। এই

পোস্টারটি বিশ্বে আলোড়ন তোলে। এটি আমাদের দেশেও প্রকাশিত হয়। পোস্টারটির দুটি পঙ্‌ক্তি: শত্রুতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে, সে হানাহানি করতে শেখে। নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে, সে বিশ্বাসী হতে শেখে। এখানে পুরোটি তুলে দিচ্ছি–

শিশুর জীবন থেকে শেখা

সমালোচনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিন্দা করতে শেখে।

শত্রুতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে হানাহানি করতে শেখে।

বিদ্রুপের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে লাজুক হতে শেখে।

অসম্মানের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে অপরাধ করতে শেখে।

ধৈর্যের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে।

উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।

প্রশংসার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে তার মূল্য দিতে শেখে।

সমতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।

নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।

গ্রহণযোগ্যতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিজেকে পছন্দ করতে শেখে।

স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে বেড়ে উঠলে
সে শিশু পৃথিবীতে ভালোবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটনী বর চেয়ে বলেছেন: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। আমাদেরও সন্তানদের দুধেভাতে মানুষ করতে হবে। তাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে। যেন বড়ো হয়ে দেশের সেবা করতে পারে। বিশ্ব শিশু দিবসের এটাই একান্ত কামনা। ❑

শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

আমরা শিশু

মাশরুফা বিনতে নূর

আমরা শিশু-আমরা মিশু
আমরা বিশ্ব বীর;
এই পৃথিবীর বুকে আমরা
রাখব উচ্চ শির।

এগিয়ে আসব সবাই মিলে
বিশ্ব শিশুর প্রাণে-
আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও
সুখের গানে গানে।

আমরা শিশু-আমরা মিশু
গড়ব সোনার দেশ;
শিশুদের জন্য আলোকিত
হোক সুন্দর পরিবেশ।

পুত্র-কন্যার নেই ভেদাভেদ
সবাই সমান আজ ;
সবার মাথায় ওঠে এখন...
স্বপ্ন রঙিন তাজ।

সপ্তম শ্রেণি, চৌধুরীরহাট এন্তেজিয়া ইসলামিয়া মডেল দাখিল মাদ্রাসা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

গল্প

eB‡qi e`‡j gvV

সুজন বড়ুয়া

কই তুলি-পৃথু, খেতে আসো।

তুলির মা বাসা থেকে ডেকে ডেকে হয়রান। কিন্তু তুলি-পৃথুর বাসায় ফেরার নাম নেই। তারা খেলছে বাসার সামনের খোলা মাঠে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাশের বাসার ছেলে-মেয়েরা। ছুটির দিন। সবাই খেলায় মাতোয়ারা। কার ডাক কে শোনে।

তুলিরা ঢাকায় থাকে। পৃথুদের বাসায় বেড়াতে এসেছে। পৃথু তুলির মেজো খালার ছেলে। গাজীপুর শহরে তাদের বাসা। খালার বাসায় বেড়াতে এলেই তুলির কেবল খেলা আর খেলা। সকালে কোনোমতে নাশতাটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। একে একে সবাই এসে জড়ো হয় মাঠে। তারপর একটার পর একটা খেলা শুরু। প্রথমে কানামাছি খেলে তো, পরে দাঁড়িয়াবান্ধা। বিকেলে ভলিবল বা অন্য কোনো নতুন খেলা। মাঠেই চলতে থাকে দৌড়ঝাঁপ। এদিকে ঘেমে-নেয়ে একাকার, তবু ক্ষান্ত দেবার নাম নেই। সকাল-সন্ধ্যা হুঁশজ্ঞান থাকে না কোনো।

মা তুলির কাণ্ড দেখেন আর হাসেন। মেজো খালাকে বলেন,

তোদের বাসার সামনের মাঠটা আসলে সুন্দর। এ মাঠের টানেই তুলি তোদের বাসায় আসে। ঢাকায় তো এরকম খেলার জায়গা নেই। পাঁচতলা বাসায় একা একা মেয়েটা একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। বই পড়ে, লুডু-ক্যারাম খেলে আর কতক্ষণ সময় কাটানো যায়!

তুলির মার মুখে নিজের বাসার প্রশংসা শুনে মেজো খালা খুশিতে ডগমগ। হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন খানিক। তারপর হালকা অভিমানের সুরে বলেন,

ভাগ্যিস, আমাদের এই মাঠটা ছিল। তা না হলে মনে হয় তোমাদের দেখাই পেতাম না আপা!

অপার হাসি-আনন্দে দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে দু-দিন সাপ্তাহিক ছুটি শেষ হয়ে গেল। রবিবার সকালে ঢাকায় রওনা হবে তুলিরা। ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে সবাই তৈরি। এমন সময় তুলি বলে,

মা, আর দু-দিন থাকি।

মা বলেন,

সে কি কথা! ঢাকায় তোমার স্কুল খোলা, কোচিং আছে। চলো, চলো।

কী আর করা। মায়ের সঙ্গেই ঢাকায় চলে আসতে হলো তুলিকে।

তারপর কয়েক মাস কেটে গেল।

তুলি-পৃথু দুজনেরই ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা শেষ। এবার পৃথুরা বেড়াতে এসেছে ঢাকায়, তুলিদের বাসায়। পাঁচতলায় বাসা। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ করার জায়গা তো আর ঢাকায় নেই। এখানে তাদের সময় কাটে কী করে!

তুলির বাবা লেখক। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এসব। বইও বেরিয়েছে অনেক। বাসায় তার কয়েক আলমারি ঠাসা বই। তিনিই সময় কাটানোর উপায় বাতলে দিলেন। বলেন,

ঢাকায় মাঠ নেই তো কী হয়েছে, আমাদের বই আছে। তোমরা বেছে বেছে পছন্দমতো বই পড়ো, ভালো সময় কাটবে।

–বলেই বাবা সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' বইটা এগিয়ে দিলেন পৃথুর দিকে।

তুলির আগে থেকেই বই পড়ার অভ্যেস। তার দেখাদেখি পৃথুও শুরু করে বই পড়া। তারপর কেবল পড়া আর পড়া। 'পাগলা দাশু' শেষ করে, পড়ে ফেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম আঁটির ভেঁপু'। আহ, কত মজা! এবার ধরে 'চাঁদের পাহাড়'। পড়তে পড়তে পৃথু যেন কোথায় হারিয়ে গেল! আফ্রিকার বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালো একা একা। কত আনন্দ! শেষ করে ফেলে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' বইটাও। এভাবে আজ এ বই শেষ তো, কাল ও বই। ঠিক যেন এক বইয়ের পোকা হয়ে গেল পৃথু।

দেখতে দেখতে যাওয়ার সময় হয়ে এল। তখন পৃথু তার মাকে বলে,

মা, আর দু-দিন থাকি, এখানে খুব ভালো লাগছে।

পৃথুর মা বলেন,

কেন রে, এত ভালো লাগার কী হলো। এখানে খেলার মাঠ নেই বলে তো তুমি আসতেই চাওনি।

পৃথু এবার আহ্লাদ ভরা গলায় বলে,

বই যে আছে অনেক। আমাদের যদি এত বই থাকত!

তুলির মা পাশেই ছিল। হেসে বলেন,

বই কিছু বেছে বেছে নিয়ে যাও।

পৃথু এবার আমতা আমতা করে বলে,

বইগুলো তো এক সময় পড়া হয়ে যাবে বড়ো খালা। তার চেয়ে আমি এখানেই থেকে যাব।

তুলি এবার দুষ্টুমির সুরে বলে,

ঠিক আছে, তুমি ঢাকায় থাকো, আমি গাজীপুরে চলে যাই। তুমি এখানে কেবল বই পড়তে থাকো আর আমি গাজীপুরে গিয়ে মাঠে খেলাধুলা করতে থাকি। আমার যে মাঠ বেশি ভালো লাগে!

পাশের ঘর থেকে সব কথা শুনছিলেন তুলির বাবা। তিনি আর চুপ থাকতে পারেন না। এগিয়ে এসে বলেন,

বইয়ের বদল মাঠ আর মাঠের বদল বই–এই নিয়েই তো তর্ক। কিন্তু শুধু বই পড়লে চলবে না, আবার শুধু খেলাধুলা করলেও চলবে না। বই পড়া আর খেলাধুলা দুটোই তোমাদের জন্য দরকার। তাই আমি বলি কী, পৃথু, তুমি কিছু বই সঙ্গে নিয়ে যাও। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে আবার ঢাকায় এসে বেড়িয়ে যেও। আর তুলিও তোমাদের ওখানে গিয়ে বেড়িয়ে আসবে। তাতে তোমাদের দুজনেরই বই পড়া, খেলাধুলা সমান চলবে, ঠিক আছে?

তুলি-পৃথু দুজনেই খুশি হয়ে ওঠে এবার। ❑

শিশুসাহিত্যিক

রাসেল সোনা

সারমিন ইসলাম রত্না

রাসেল সোনা চাঁদের কণা
মুখ করো না ভার।
তোমার জন্য খুলে দিলাম
স্বপ্নলোকের দাঁড়।

রাসেল সোনা চাঁদের কণা
দুঃখ মুছে নাও।
চাঁদের গাড়ি দিলাম কিনে
হাওয়ায় ভেসে যাও।

রাসেল সোনা চাঁদের কণা
কাঁদছ কেন তুমি?
এই যে সোনার বাংলাদেশ
তোমার জন্মভূমি।

রাসেল তুমি

নূরে আলম সিদ্দিকী শান্ত

রাসেল তুমি আজও আছো,
বাংলার সকল শিশুর মধ্যে।
নিষ্পাপ চোখে চেয়ে থাকা,
পুকুর ঘাটে ফোটা পদ্মে।

তুমি আছো পাখির গানে,
সৌরভ জাগা বকুল ফুলে।
তুমি আছো দস্যি ছেলের,
সাইকেলের বাজানো বেলে।

তুমি চঞ্চল নদীর বুকে,
সকাল দুপুর উড়া গাঙচিল।
ধন্য তুমি মুজিব সন্তান,
তোমার শোকে বাংলার প্রাণ নীল।

সুতো কাঁটা ঘুড়ির মতন,
উড়ছ তুমি বাংলার আকাশে।
দেশের সকল শিশুর হৃদয়,
তোমায় ভীষণ ভালোবাসে।

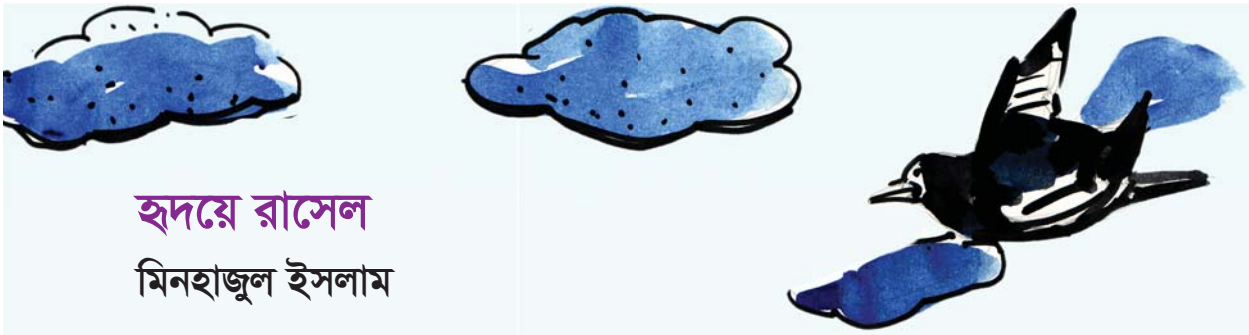

হৃদয়ে রাসেল

মিনহাজুল ইসলাম

বইয়ের পাতায় পড়ি যখন
শেখ রাসেলের কথা
হই-হুল্লোরে মাতিয়ে রাখতেন
ধানমন্ডির সারা বাড়িটা।

জন্মদিনে নিষ্পাপ মুখ জড়িয়ে থাকে
স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে
প্রিয় শেখ রাসেলের জন্য
মনে কষ্টের সুর বাজে।

একাদশ শ্রেণি, পলিটেকনিক কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা

ভালোবাসার ফুল

মো. তৌফিক আলম

শেখ রাসেল সবার কাছে
ভালোবাসার এক ফুল
তার সাথে অন্য কারো
হয় না কোনো তুল।

জন্মদিনে ফিরে আসে
শেখ রাসেলের স্মৃতি
স্মরণ করি হৃদয় দিয়ে
জানাই ভালোবাসা ও প্রীতি।

একাদশ শ্রেণি, মর্ডান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা

রাসেল আমার বন্ধু

মুজাহিদুল ইসলাম

রাসেল তুমি কই হারালে
আবার ফিরে এসো
পাখির সাথে ফুলের সাথে
আবার তুমি হেসো।

রাসেল তুমি ওই আকাশের
কোন তারাটা বলো
তোমার জন্য রোজই কাঁদে
ফুল-পাখিদের দলও।

বন্ধু তুমি কই হারালে
কোন সে পরির দেশে
সারাজীবন তোমায় রাসেল
যাব ভালোবেসে।

নবম শ্রেণি, শেরউড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শেরপুর, বগুড়া

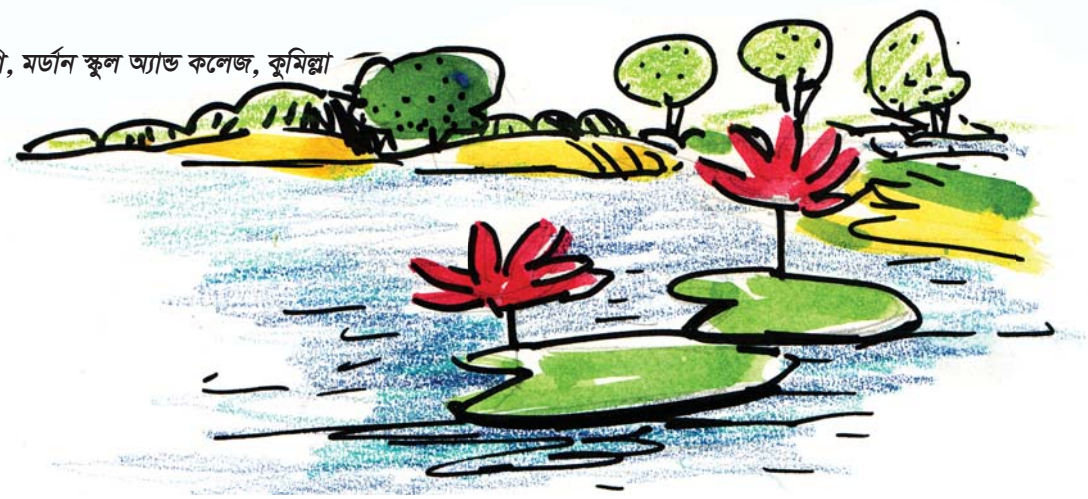

শেখ রাসেলের নিঃসঙ্গ দিন

রফিকুর রশীদ

রাসেলের ভীষণ জ্বর।

গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি। চোখের ভেতরে জ্বালা করছে। একটুখানি কাঁদতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু কান্না আসছে না যে! যন্ত্রণায় কপালের দুপাশের রগ দাপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন শিরা-উপশিরা যে-কোনো সময় ছিঁড়ে যাবে। কী সাংঘাতিক অবস্থা!

এমন আকাশ-পাতাল যার জ্বর, তার কি মাথা ঠিক থাকে! জ্বরের ঘোরে কত কী যে মনের ভেতরে ঘুরপাক খায়, তা কি মুখে প্রকাশ করা যায়! মুখের উপরে নিয়ন্ত্রণ নেই, কত আজেবাজে কথা হুড়মুড় করে ঠেলে বেরোতে চাইছে, বেরিয়ে যাচ্ছেও। সে সব কথা কারো কানে গেলে নির্ঘাৎ বলবে– জ্বরের ঘোরে ছেলেটা ভুল বকছে। কেউ বা এক আঁজলা সহানুভূতিও দেখাতে পারে– আহা, এমন দুঃসময়ে ওর পাশে কেউ নেই! একেবারে একা একা কাতরাচ্ছে! সত্যিই কেউ নেই মাথার পাশে!

এতক্ষণে চোখের কোনা ভিজে আসে রাসেলের। ভাবনার সবগুলো সুতো একত্রিত করেও সে উত্তর খুঁজে পায় না– কখন কীভাবে সে এ রকম একা হয়ে গেল! তার কি আপনজন বলতে কেউ ছিল না কোনো কালে! মা-বাবা, ভাই-বোন, ছোটো-বড়ো প্রাণের স্বজন তার কেউ ছিল না? মাও ছিল না? মায়ের কথা মনে পড়তেই চোখ ফেটে কান্না আসে। 'মাগো' বলে একবার অস্ফুটে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কী আশ্চর্য ! চরম এই দুঃসময়ে হাসুবুও নেই তার মাথার পাশে। সবার বড়ো বোন হাসুবু, বাড়ির সবার বিপদ-আপদের খবর সে সবার আগে টের পায়। নিজের ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে সবার পাশে সে ছুটে যায়। রাসেল সবার ছোটো ভাই। অতি আদরের রাসেল। সেই রাসেলের এমন কষ্টের সময়ে সে দূরে থাকতে পারে! তাই কখনো হয়! সে জানে, হাসুবুর অনেক কাজ। সারাদেশ নিয়ে তার ভাবনা। দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখতে পায় হাসুবুর মুখের আদলে। তাদের রাশি রাশি প্রত্যাশা মুজিবকন্যার কাছে। মানুষের হাজারো স্বপ্ন ঘিরে আছে তাঁর চারপাশে। তাই বলে সহোদর ছোটো ভাইটিকে এ সময়ে মনে পড়বে না! রাসেল আবারো ফুঁপিয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে– জয় এসে একবার কপালে হাত রাখলেও তো পারে! ছোট্ট তুলতুলে দুটি হাত। কী যে আদুরে ডাক– 'মামু'! কী হয়, একবার এসে গলা জড়িয়ে ধরলে! আহা, ওইটুকু মানুষের সঙ্গে মধুমাখা কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে!

রাসেলের ছোটো আপুর নাম রেহানা। না, তাকে বুবু ডাকে না রাসেল, আপু কিংবা ছোটো আপু বলে ডাকে। হাসুবুর কোলে জয় এসেছে সেই যুদ্ধের মধ্যে। তারপর থেকে রাসেলের প্রতি মনোযোগ একটুখানি কমে এসেছে। তাছাড়া সবসময় তো এ-বাড়িতে সে থাকে না। থাকে ছোটো আপু। বয়সে অনেক ছোটো, তবু রাসেল তার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। প্রিয় ছোটো ভাই। রাসেলের জন্যে কী-ই না করে সে! রাসেল পাখি ভালোবাসে বলে শেষ জন্মদিনে বাজার থেকে উচ্চমূল্য দিয়ে খুব চমৎকার এক ময়না পাখি এনে দেয় ভাইকে। বোল-ফোটা ময়না, দাম তো বেশি হবেই। তাও আবার সাধারণ কোনো বোল নয়। কে যেন সেই ময়নাকে খুব যত্ন করে 'জয় বাংলা' বলতে শিখিয়েছে। খুব স্পষ্ট তার উচ্চারণ, তবু কান খাড়া করে শুনলেই বুঝা যায় সে 'জয় বাংলা' বলতে চাইছে। ময়নার কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শুনে রাসেল খুব আনন্দ পায়। ঘুরে ফিরে ময়নার কাছে এসে সেও বার বার হাত উঁচিয়ে স্লোগান ধরে 'জয় বাংলা'। রমা ভাই এত কাজের মাঝেও কখন যে গোপনে ময়নার সঙ্গে ভাব করেছে এবং একটি বাক্য শিখিয়েছে সে কথা কেউ টেরই পায়নি। হঠাৎ একদিন রাসেলের ইশকুলে যাবার সময় শোনা গেল– ময়না নতুন বোল ধরেছে । সে বলছে– ভাইয়া ইশকুলে যাবে।

রাসেল তো ভীষণ অবাক, এ কথা ওকে কে শেখালো! রমা ভাই মুচকি মুচকি হাসে আর বলে– এবার ইশকুলে না গিয়ে উপায় আছে!

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় রাসেল। ইশকুলে না যাবার কথা তো কখনো বলেনি সে! এসব কথার মানে কী! বরং ইশকুলে না গেলেই তো খারাপ লাগে তার! বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না, কথা হয় না, রাজিয়া ম্যাডামের আদর পাওয়া হয় না। তখন এ বাড়িতেও ভালো লাগে না। রমা ভাই নিজের ভুল বুঝতে পারে। ভেবেচিন্তে সে নতুন প্রস্তাব রাখে। ছোটো আপু যদি এবার আর একটা ময়না কিনে দেয়, তাহলে তাকে সে 'আমার সোনার বাংলা' শেখাবে। প্রস্তাব শুনে রাসেল তো মহাখুশি। লাফিয়ে ওঠে আনন্দে,

তার মানে আমাদের জাতীয় সংগীতও গাইতে পারবে?

পারবে পারবে।

রমা ভাই আশ্বস্ত করে, চেষ্টা করলেই পারবে। তারপর কী মনে করে রাসেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, কেন, এই সোনার বাংলা কি শুধুই আমাদের? পাখিদের নয়!

রাসেল বলে,

না না, তা কী করে হয়! আমাদের বইয়ে লেখা আছে– এ দেশ পাখির দেশ, নদীর দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ–

রমা ভাই বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা দেয়,

তবে যে! সোনার বাংলা ঠিকই পারবে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে, সেই সোনার বাংলা গাওয়া ময়না পাখি আর কেনা হয়নি। কেন হয়নি সে কথা মনে করার চেষ্টা করে রাসেল। কেন হয়নি? ছোটো আপু কি রাজি হয়নি! এমন পরিকল্পনার কথা শুনলে এ বাড়িতে কে আপত্তি করবে! মাথা খারাপ! আব্বাকে বললে তো সবার আগে তিনিই রাজি হবেন! 'আমার সোনার বাংলা' তাঁর খুবই প্রিয় গান যে!

জ্বরের ঘোরে রাসেলের ভাবনাসূত্র এলোমেলো হয়ে যায়। ছোটো আপুকে মনে পড়ে, আবার পড়েও না। ধূসর হয়ে যায় স্মৃতির শামিয়ানা। রমা ভাইয়ের মুখের ছবিও যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে। খানিক চেনা আবার অচেনাও মনে হয়। এতটা জ্বরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে রাসেল, এ সময়ে একবার তার কপালে মমতার হাত ছোঁয়াবে না ছোটো আপু! কী হয়েছে রমা ভাইয়ের, কাছে এসেও আসছে না কেন! কপালে জলপট্টি দিচ্ছে না, একটুও আদর করছে না, কী হয়েছে তার? আহা, চোখের ভেতরে এমন জ্বালা করছে কেন! এ কী অসহ্য জ্বালা! উহ, বাবা গো!

হঠাৎ মেহেদিরাঙা একটি হাত এগিয়ে আসে রাসেলের মাথার দিকে। হাত ভর্তি চুড়ি টুংটাং করে বেজে ওঠে। যেন পিয়ানো বেজে ওঠে নিকটে কোথাও। রাসেলের স্মৃতি থেকে ভেসে আসে সেতারবাদ্যের মধুর ধ্বনি। কিন্তু সেতারের ধ্বনি আর পিয়ানোর ধ্বনি কি এক হলো! পার্থক্য যা-ই থাক, ওই ধ্বনিতরঙ্গ

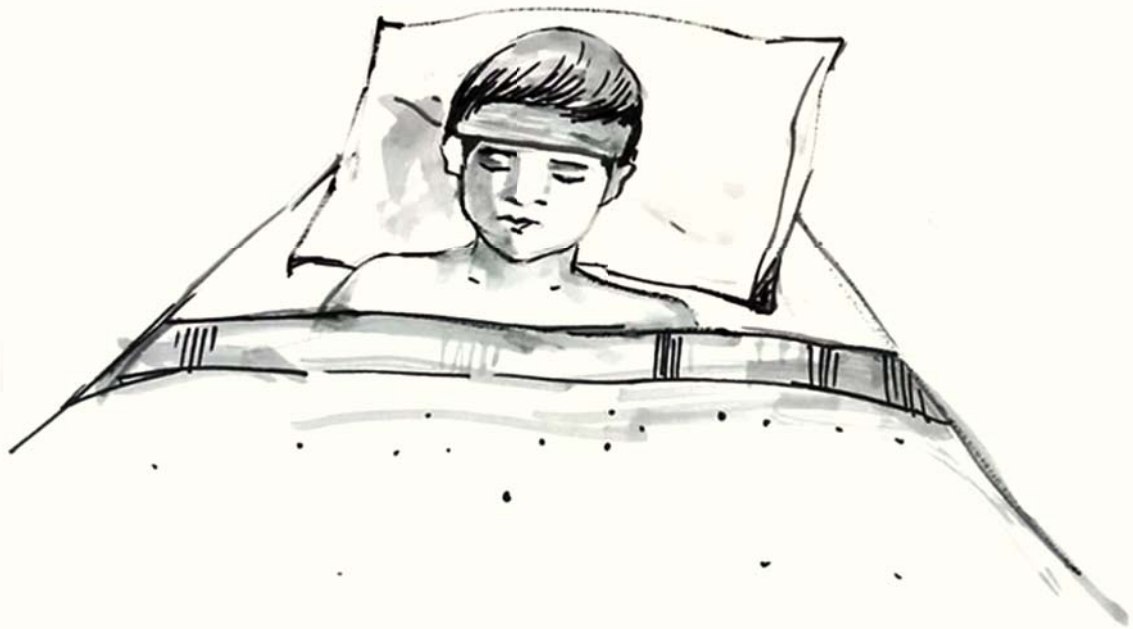

থেকেই ভেসে আসে বড়ো ভাই এবং বড়ো ভাবির মুখ। এই মেহেদি রাঙা হাত কি তবে বড়ো ভাবি সুলতানা কামালের? সরু সরু আঙুল! নখে জেল্লাদার নেলপলিশ! হাতের তালোয়, আঙুলের ডগায় মেহেদির উল্কিতে নকশা আঁকা! কী মিষ্টি আল্পনা! এ হাত নিশ্চয়ই সদ্যবিবাহিত ছোটো ভাবি রোজি জামালের। নতুন মানুষ, তবু রাসেলের সঙ্গে কী যে খুনসুটি! কী যে দুষ্টুমি! আদর-সোহাগে ছোটোদের জাপটে ধরে হাতের মুঠোয় ঠিকই মেহেদির ছোপ লাগিয়ে দেয়। জ্বরের ঘোরে রাসেলের সেই হাত ছোটো ভাবির হাতের কোমল পরশ খুঁজে ফেরে।

কী আশ্চর্য! বাড়িয়ে দেওয়া সেই হাতটা গেলো কোথায়! দুই ভাবির সঙ্গেই রাসেলের কত না মধুর সম্পর্ক! দুজনের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসবে না– মমতামাখা হাতের ছোঁয়া দিতে! কোনো কারণে সবাই কি তাকে ত্যাগ করেছে! পরিবারের সবচেয়ে ছোটো সদস্যকে এভাবে একাকী ফেলে যাবার কোনো মানে হয়! এই জ্বরতপ্ত শরীরে রাসেল এখন কী করে!

বিছানা থেকে উঠে বসতে ইচ্ছে করে রাসেলের। চেষ্টাও করে। কিন্তু সে পারে না।

বিছানা ছেড়ে নেমে আসতে ইচ্ছে হয় তার। এমন দুঃসময়ে কেউ তার পাশে নেই। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে সে থাকবে কী করে! রাতে ঘুমোবার সময় সে কি এ রকম একা ছিল! মা ছিল না পাশে! কিছুই মনে পড়ছে না কেন! আকাশ কাঁপানো জ্বর এলে কি সবারই এ রকম হয়!

প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেলে সে ভাবে, কী শুনতে সে কী শুনেছে তার কি ঠিক আছে! এখানে এই বত্রিশ নম্বর বাড়িতে গোলাগুলি আসবে কোত্থেকে! এখানে বাংলাদেশের স্থপতি বাস করেন সপরিবারে। সরকারি আবাসনের রাজকীয় নিরাপত্তা তো কখনো চাননি তিনি! গোটা জাতি তাঁকে পিতার সম্মানে ভূষিত করেছে, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, মমতায় নিরাপত্তা দিয়েছে। তাঁর বাড়িতে গোলাগুলি!

রাসেলের খুব ইচ্ছে করে বিছানা থেকে নেমে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পা দুটো যে নামাতেই পারছে না সে! উঠে বসতেও পারছে না। এমনকি পাশ ফিরতেও পারছে না। শরীর তার কথা শুনছে না মোটেই। তবু কী যে তার ইচ্ছের জোর, শরীরের বাধা না মেনে সে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে।

প্রথমেই তার মায়ের ঘর। মায়ের কাছেই তো আসতে চেয়েছিল, তার বেশ মনে পড়ে। কারা যেন তাকে দুহাতে শক্ত করে ধরে মায়ের ঘরে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এ কী! সেই ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে আছে তার গর্ভধারিনী মা। এ অবস্থায় মাকে দেখে সে আঁৎকে ওঠে। মা বলে জোরে চিৎকার করে। কিন্তু সে চিৎকার মোটেই স্ফুট হয় না, উচ্চারিত হয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে রাসেলের। আতঙ্কে সে পালাতে চায়। কিন্তু পালাবে কোথায়! তার ডানে-বামে সামনে-পেছনে লাল টকটকে রক্তধারার মধ্যে পড়ে আছে মা, ভাই, ভাবি, নাসের কাকা, বকুলসহ বাড়ি ভর্তি কাজের মানুষ– সবার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে চতুর্দিকে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতেই রাসেলের চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। রক্তের আল্পনা আঁকা সিঁড়ির উপরে পড়ে আছে তার বাবার বুলেটবিদ্ধ নিথর দেহ। চোখ থেকে ছিটকে পড়েছে তাঁর কালো ফ্রেমের প্রিয় চশমা। এই চশমা পরে তিনি নাকি ভবিষ্যৎ দেখতেন। হায় পিতা! এমন অন্ধকার ভবিষ্যৎ কখনো কল্পনা করেছেন তিনি! চশমা তাঁকে কি আর কোনো ভবিষ্যৎ দেখাবে!

রাসেলের প্রচণ্ড জ্বর। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। থেকে থেকে চেতনা হারায়, আবার চেতনা ফিরে পায়। নিঃসঙ্গ রাসেল এক সময় আবিষ্কার করে– তার বুকের মাঝে বিশাল এক গহ্বর! সে যেন অচেনা কোনো পাতালে নেমে যাওয়া সুড়ঙ্গপথ। সেই সুড়ঙ্গের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে নাড়ির বাঁধনে বাঁধা মা জননী। ❑

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

ইচ্ছে

রোকসানা গুলশান

ইচ্ছে আছে হরেক রকম, ইচ্ছে নিয়ে ঘুরি
রঙিন সুতোর ঠাসবুনটে, ওড়াই মেঘের ঘুড়ি

ইচ্ছে আছে জরির পাখায়, দেশ-বিদেশে যাই
ইচ্ছে আমার মায়ের মুখে, হাসির ফুল ফোটাই

ইচ্ছে করে সুরের সুধায়, ভরিয়ে তুলি মন
বর্ণমালার ছন্দ-গাথায়, জুড়াই আলাপন

বৃষ্টি দেখে ইচ্ছে করে, রংধনু মেজাজে
নিজের আলোর বলয় বাড়াই, নীরব সব কাজে

ইচ্ছে করে ঘাসের পরে, ঘূর্ণি হয়ে ঘুরি
অবসরের প্রহর পেরুই, অন্তরে ডুবুরি!

মনোযোগের বিন্দু ছোঁয়া, মুক্তা যদি পাই
ইচ্ছে তবে তোমার সাথে, স্বপ্নকে মেলাই!

ইচ্ছেগুলো প্রজাপতি, ফুল-বনেরই পাশে
সুবাস ভরা কৌটা খুলি, আনন্দেরই আশে!

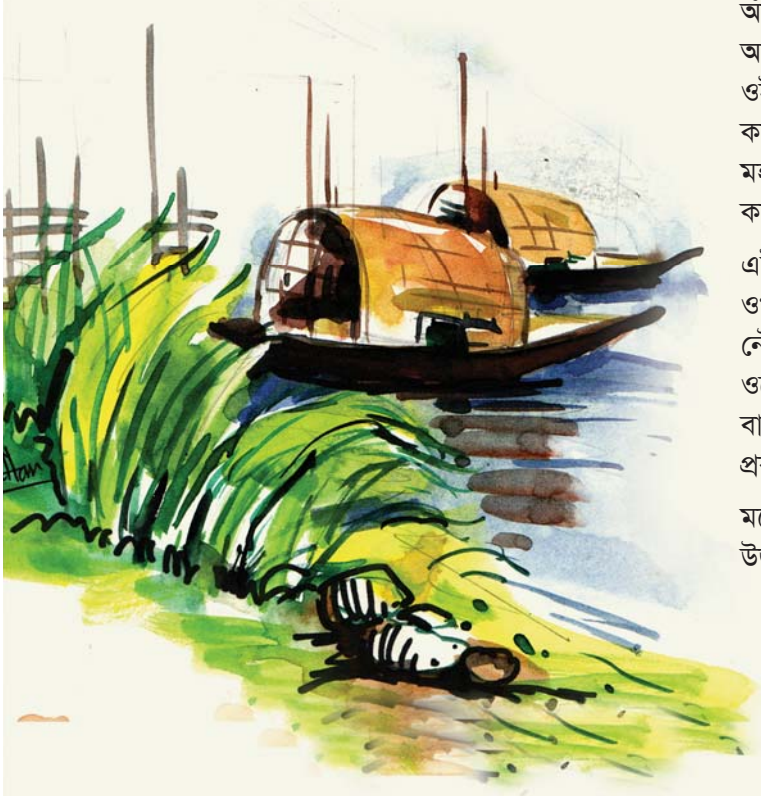

কাব্য-অলংকার

আতিক রহমান

ওই বৃষ্টির কাছে থেকে ছন্দ আনি ধার
হৃদয়পটে ছন্দ-গাথি কাব্য সোনার হার ।
দেয় সে আবেগ কি ভাবাবেগ ঝরনাধারার গীরি
এই প্রকৃতির বৃক্ষগুলো কাব্যলেখার সিঁড়ি !
সুবাসি ফুল আমাকে দেয় শব্দমালার ডালি
কবিতাতে হলাম আমি ফুল-ফুটানোর মালি !

আঁকাবাঁকা বইতে থাকা সেই নদীটির পাড়ে-
অল্প অল্প চিত্রকল্প ধার দেয় আমারে ।
ওই আকাশে উড়তে গিয়ে ঘুরতে থাকে চিলে
কল্পকথার গল্প লেখি ভাবনারা সব মিলে !
মহানন্দে ঢেউয়ের ছন্দে মুখর সমুদ্দুর-
কাব্যে আমার দেয় ভরিয়ে গভীরতার সুর।

এই বর্ষায় শাপলা এবং পদ্মফুলের বিল,
ওখান থেকে তুলে আনি কাব্য-অন্তমিল !
নৌকা হয়ে ভেসে বেড়ায় প্রিয় বালিহাঁস
ওদের থেকে তুলে আনি,কাব্য-অনুপ্রাস !
বাবুই পাখির বাসাতে পাই কাব্য-উপমা তো
প্রকৃতি কয় লাগবে কি আর? হৃদয়ে কান পাতো!

মনের গাড়ি-প্রাণসোয়ারি, প্রকৃতি-সংসার-
উজার করে কলমে দেয়, কাব্য-অলংকার।

গল্প

পুঁচকে গাধার স্বপ্ন

সৈয়দ মনজুর কবির

বনের ঠিক মাঝখানে গোটা তিনেক মশাল জ্বালানো। আর তার আলোতেই সবাই গোল করে বসে আছে। বুড়ো হাতি আজকের জরুরি সভার রাজা। এমনিতে বনের রাজা হলো রাগি বাঘ মামা। কিন্তু আজ হঠাৎ তার মাসি অসুস্থ। তাই গিয়েছে পাশের বনে দেখতে। এদিকে হলো ভীষণ আপদ। কি ব্যাপার! বিপদ না বলে আপদ বলা হচ্ছে কেন? সে ওই পুঁচকে গাধাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

কাচুমাচু হয়ে বসে আছে তার মায়ের পাশেই। শিয়াল পণ্ডিতের নির্দেশে সে মিনমিনিয়ে বলতে শুরু করল, আসলে হয়েছে কি, আসলে হয়েছে কি

লম্বাটে হনুমান চেঁচিয়ে উঠে, কি হয়েছে সেটাই তো জানতে এসেছি এই রাত বিরাতে। সেটা বলে ফেললেই তো হয়।

হ্যাঁ আমি বলছি, আমি বলছি। আসলে হয়েছে কি, ওই যে বড়ো মাঠটায় যখন আমরা সবাই আনন্দ করছিলাম, তখন হঠাৎ মাটি ফেটে যেতে থাকল। আর সবাই দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাই কিন্তু বাঘ মামা তা পারলেন না। তিনি মাটির ফাটলের

গভীরে হারিয়ে গেলেন। ওনার জন্য সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। তিনি রাগি ঠিকই কিন্তু আমাদের সকলের কত উপকার করেছেন।

আরে রাখো তোমার বানানো গল্প, এবার চেঁচিয়ে উঠে সবচেয়ে পেটুক রামছাগল-এ তো আজব ব্যাপার! কোথায় তোমার মাঠ? কোথায় সবার আনন্দ করা? আর কোথায় আমাদের রাজার মাটির ফাটলের ভিতর পড়ে যাওয়া?

রামছাগলের কথা শুনে খরগোশ, বেজি, বানর, গরু, ভেড়া, হরিণ সকলেই একসাথে বলে উঠল - হ্যাঁ তাই তো, কোথায় হলো এসব?

পুঁচকে গাধা সবার প্রশ্ন শুনে ভয়ে চুপসে যায়। কোনোমতে বলল, ওই তো ঘটনার পরই মা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলেন– কিরে আবার ঘুমের মধ্যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখছিস!

এ কথা শুনে বনের সবাই তো থ। এই সেই আপদ যার জন্য সবাই ঘুম তাড়িয়ে এখানে এসেছে? হঠাৎ-ই প্রচণ্ড হাসিতে সবাই ফেটে পড়ল। শুধু দুজন হাসল না - একজন হলো পুঁচকে গাধা আর দ্বিতীয় হলো তার মা। মায়ের মুখ দুশ্চিন্তায় ভরা। সে-ই তো জরুরি সভার জন্য অনুরোধ করছে। কিন্তু এরা কেউই তো বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। বাঘ মামা থাকলে হয়ত বুঝতে পারতেন। এর আগেও দু'একবার পুঁচকে গাধার স্বপ্নের কথা বাঘ মামাকে বলেছে। তিনি অনেক অবাক হয়েছেন আবার পরে বুঝতেও পেরেছেন যে, পুঁচকে গাধা যে সে টাইপের না। কীভাবে যেন স্বপ্নে সে যা দেখে তা হুবহু মিলে যায়। মায়ের মনে ভয়, নিশ্চয়ই তাদের বনের মধ্যে কোনো ভয়ানক বিপদ হতে যাচ্ছে, যেখানে তাদের রাজারই বিপদ। মা বুঝতে পারলেন এদেরকে কিছুতেই বোঝানো সম্ভব না। কারণ, দু'মাস আগের ঘটনাটাও তারা বুঝতে পারেনি। সেবারও রাম ছাগলের হাসাহাসিতে সবাই যোগ দিয়েছিল। তামাশা করে বলেছিল– বলে কি, এ বনে নাকি চোরাবালি আছে? হা, হা, হা। আর এক এক করে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা নাকি ওই চোরাবালিতেই পরে নিরুদ্দেশ হয়েছে! হাহ হাহ হা।

কিন্তু তখন বাঘ মামা মন দিয়ে সব শুনেছিলেন এবং বনের ভিতর খুঁজে দেখার আয়োজন করেছিলেন। করেছিলেন প্রতি গ্রুপে দুজন করে মোট বিশটি গ্রুপ। একজন করে দল করলে তো হয়েছিল! দুইজন হওয়াতে তা সম্ভব হয়েছে। হঠাৎ গরুটা ওই চোরাবালিতে পড়া মাত্রই তার সহযোগী বানর চেঁচিয়ে সবাইকে জড়ো করেছে। আর গরুটাকেও সবাই মিলে উদ্ধার করেছে। পরে চোরাবালিটা মোটা গাছের ডালের বেড়া দিয়ে ঢেকেও দিয়েছে চিরতরে। এটাতো এ জন্মেও কেউ বের করতে পারত না। ওটা ছিল এই পুঁচকে গাধার স্বপ্ন দেখারই ফল। কি আর করা-মনের দুঃখে বাচ্চা গাধাটিকে নিয়ে মা বাড়ি ফিরে যায়। আর সবাই এবারও রামছাগলের হাসির সাথে মিলিয়ে হাসতে হাসতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

পরদিন দুপুরে বাঘ মামা পাশের বন থেকে ফিরে আসে। এসেই দেখে নববর্ষের আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্য সবাই সকাল থেকে রেডি হয়ে বসে আছে।

অনুষ্ঠান হবে বনের মাঝে বড়ো মাঠে। শুধু রাজামশাইয়ের অনুমতির অপেক্ষা। মাসিকে ভালো দেখে এসে বাঘ মামা ভীষণ খুশি। তিনি যেই না অনুমতি দিতে যাবেন ঠিক তখনই ছোট্ট গাধার মা ভীষণ কেঁদে উঠল। রাজামশাই রাজামশাই, একটা বিপদ আছে। বাঘ মামা দেখলেন ভিড় ঠেলে ঠুলে পরিচিত গাধাটাই আসছে।

তক্ষুণি রামছাগলটা জোরে জোরে বলে উঠে– এই রে, সেই হাস্যকর কাহিনিটা বুঝি আবার শুনতে হবে।

বাঘ মামা বললেন কি সেই হাস্যকর কাহিনি?

মা চোখে জল নিয়ে কাছে এসে বলল - রাজামশাই আমার ছোট্ট বাচ্চাটা আবার এক স্বপ্ন দেখেছে। বড়ো মাঠে যখন সবাই আনন্দ করবে তখন হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠে বিশাল ফাঁকা হয়ে যাবে। সবাই পালাতে পারলেও আপনি ওই খাদে পড়ে যাবেন।

কি বললে? এটা কবেকার ঘটনা?

জি আজ্ঞে, গতকাল রাতের শুরুতেই ও স্বপ্নটি দেখে ভয়ে কেঁপে উঠে।

ও কি কেঁদেই চলেছে? আর কিছুই খাচ্ছে না?

জি আজ্ঞে, তাতেই তো চিন্তিত হয়ে পড়ি আর বুড়ো হাতি দাদুকে জরুরি সভা ডাকার অনুরোধ করি।

সর্বনাশ, ওকি কিছুই খাচ্ছে না?

জি না, জি না রাজামশাই। দুধ পর্যন্ত খাচ্ছে না।

তার মানে কি? আজই কি সেই দিন? আর সময়ও তো বুঝি ঘনিয়ে এসেছে।

মা জোরে কেঁদে উঠে। এমনই তো হচ্ছে দেখি রাজামশাই। যখন ও খাওয়া বন্ধ করে দেয় তখনই স্বপ্নে যা দেখেছিল সেটা ঘটে যায়। আর খাওয়া শুরু করতেই ঘটনাটাও শেষ হয়ে যায়।

বাঘ মামা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি গত দুইবারের ঘটনায় একটা জিনিস বুঝেছেন যে, ওই বাচ্চা গাধাটার স্বপ্নের একটা বিশেষ দিক আছে। ওটা সত্যি হলে ও খাওয়া বন্ধ করে দেয় আর কাঁদে। আজও যখন এমনই হলো, তার মানে অবশ্যই কিছু ঘটবে। আর ও দেখেছে মাটি কেঁপে বিরাট ফাটল ধরবে। ওটা তো ভূমিকম্পের কথাই মনে করাচ্ছে। এ অঞ্চলে অনেক বছর পরপর ভীষণ ভূমিকম্প হয়। বাঘ মামা তার দাদার কাছে শুনেছেন পাশের বন আর এই বন নাকি আগে একটিই ছিল। ভূমিকম্পে মাঝ বরাবর মাটিতে যে ফাটল হয় তাতেই দু'টি বনের সৃষ্টি। মনে মনে ভাবতেই বাঘ মামা শিউরে উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হুংকার দিয়ে বললেন, যে যেখানে আছো সবাইকে বলো দ্রুত বনের উত্তর দিকে বিশাল

শিলা পাথরের উপর গিয়ে হাজির হতে। এক্ষুণি যাও, সবাইকে বলো সেখানেই যেন অপেক্ষা করে আমার পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত।

মুহূর্তেই বনের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়। যে যেভাবে পারল সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে ওই শিলা পাথরের উপর গিয়ে উঠে। শুধু একজন বাদে। সে হলো ওই রামছাগল। সে ভাবলো–এই তো সুযোগ একা একা ওই মাঠে গিয়ে নতুন লকলকে সবুজ ঘাসগুলো খাবে। তারপর সুযোগ বুঝে এক দৌড়ে চলে যাবে ঐ পাথরে। যেই ভাবা সেই কাজ। চুপিচুপি চলে যায় ঐ সবুজ মাঠে। আহ্ পরান ভরে উঠে। বনের সবাই কি বোকা। ওই পুঁচকে গাধাটার কথায় কি-না মেতে উঠল। আহ্ কি মজা এই কচি ঘাসগুলো। খেতে খেতে যখন ঠিক মাঠের মাঝামাঝি গেল তখনই মাঠটি উঠল দুলে। একি! পুঁচকে গাধাটার স্বপ্নটা সত্যি হতে যাচ্ছে নাকি? মনে ভয় ভয় লাগতে শুরু করে। ভাবল, পুঁচকেটার স্বপ্নের কথায় উপহাস করে বিপদেই কি পড়তে যাচ্ছি না কি? না আর না, এখনই দৌড় লাগাতে হবে, ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দ করে পুরো মাঠটাই নিচের দিকে দেবে যেতে থাকে। রামছাগল তার শেষ শক্তি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফেটে যাওয়া মাটির নিচ থেকে কোনোমতে উপরে নিরাপদে পৌঁছায়। তারপর এক দৌড়ে ছুটে চলে উত্তরে শিলা পাথরের দিকে।

এদিকে বিশাল শিলা পাথরের উপর বনের সকলে তো ভয়ে কাঁপছে। এমন মাটির দুলুনি তো তারা কখনো পায়নি। সবাই ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছে না। পুঁচকে গাধাটি মায়ের চার পায়ের ভিতরে লেপটে রয়েছে। ভয়ংকর দুলুনি থামতেই মা বেশ জোরে বাঘ মামাকে ডাকল রাজামশাই, রাজামশাই, বাচ্চাটা দুধ খেতে শুরু করেছে।

বাঘ মামা শুনে তো ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন। তার মানে? তার মানে, এখন বিপদ কেটে গেছে? আহা, কি আনন্দ, কি আনন্দ! বলে তাধিন তাধিন নাচতে লাগলেন। সেই সাথে বনের সকলেই মহা আনন্দে নাচে যোগ দিলো! আর রামছাগল লজ্জায় মাথা নত করে পুচকের সামনে এসে বলল, ভাতিজা তোমাকে উপহাস করায় আমি খুবই লজ্জিত। তোমার জন্যই আমিও মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমার আর কোনো লজ্জা নেই।

পুঁচকে গাধা তার লম্বা কান দুটো নেড়ে নেড়ে জানিয়ে দিল তার আনন্দের বার্তা। আর মা তার পুঁচকে গাধাকে আনন্দে, গর্বে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকল। ❑

শিশুসাহিত্যিক

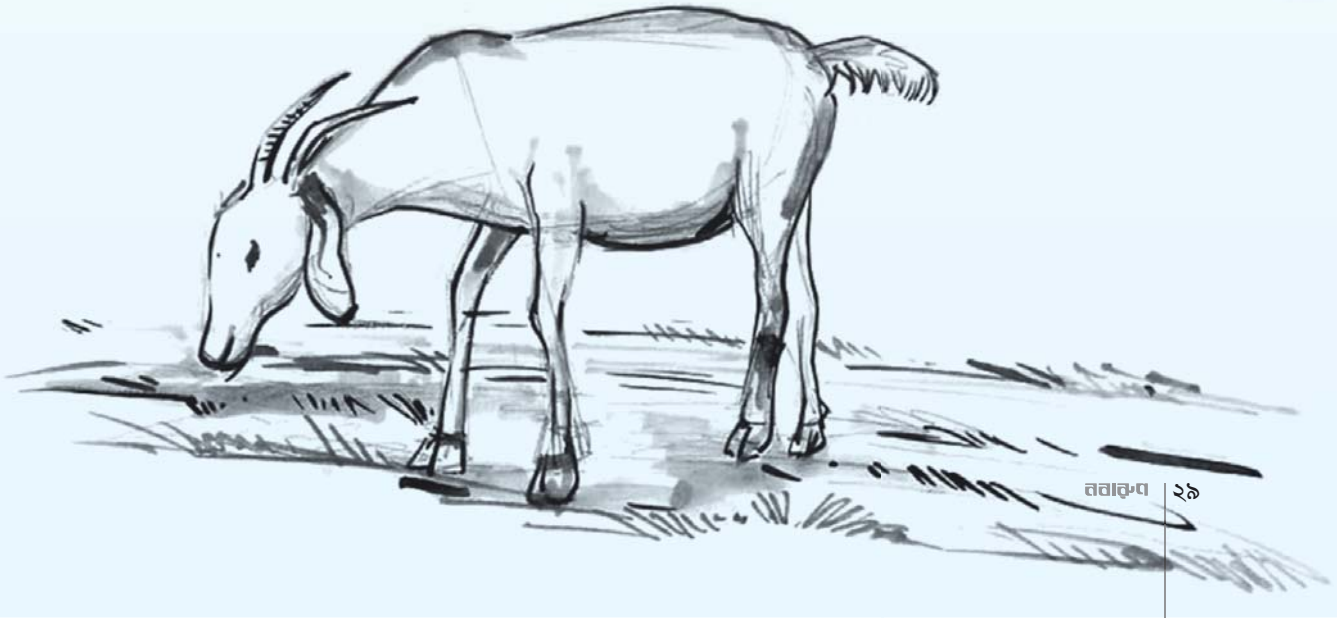

গল্প

স্বপ্ন সেতু

নাজমুল হুদা

দুপুর না গড়াতেই হক মামা হাজির। মামা বাসায় আসা মানেই আনলিমিডেট আড্ডা। জিসান জিনিয়া দুজনই আনন্দে আটখানা। মামা আসলেই তাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হবে। জিনিয়া তো প্রশ্ন জমা করেই রাখে। এবার সে সাতে পা দিল। ভীষণ কৌতূহলী। জিসান হয়েছে ভাবুক প্রকৃতির; রোমাঞ্চপ্রিয়। তার মধ্যে অনুসন্ধিৎসু ভাব কাজ করে। সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়ে। হক মামা আসা মানেই বেড়ানোর নতুন সুযোগ। মামা বাসায় ঢুকে ব্যাগ রাখার সাথে সাথেই চোখ বড়ো করে আহ্লাদিত কণ্ঠে জিনিয়া জিজ্ঞেস করল, 'মামা, তুমি না সকালেই রওনা হলে? এত তাড়াতাড়ি কীভাবে চলে এলে?

হক সাহেব বিজয়ের হাসি মুখে নিয়ে বললেন–'জাদু, বুঝলি জিনিয়া জাদু'!

'কিসের জাদু মামা'?

'জানিস না! পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেছে! এখন আর সারাদিন গাড়িতে বসে থাকা লাগবে না। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টায় ঢাকা খুলনা'!

'তাহলে তো একবার নানু বাড়ি যেতেই হয় মামা'

'একশবার যাবি, তুই যাবি তোর বাপও যাবে'

হক সাহেবের চোখে মুখে উচ্ছ্বাস; আত্মবিশ্বাস। জিনিয়ার মা আফরোজা বেগম আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এসে হক সাহেবের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন 'ওর বাপ যাক না যাক আমি পদ্মা সেতু পার হয়ে বাপের বাড়ি যাব, আহ! কতদিনের স্বপ্ন'

‘হ্যাঁ আপা, আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে’

‘আগে খুলনা থেকে ঢাকায় আসতে যেতে কতই না কষ্ট করতে হয়েছে। তোর দুলাভাই তো এতদিন দূরত্বের দোহাই দিয়ে যেতে দিতে চাইত না।

‘এখন দুলাভাইও সুরসুর করে যাবে। না গেলেও কোনো চিন্তা নেই আপা। কাল শুক্রবার, ছুটির দিন। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। গেট রেডি আপা..

‘খাবার দিয়েছি, আয় ফ্রেস হয়ে খেতে বস ’

হক সাহেব আফরোজা বেগমের কাছাকাছি এসে মুখ নামিয়ে বলে উঠল ‘আমার কাছে পদ্মা সেতুর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা কি জানো আপা’?

কী?

‘সকালে বাসা থেকে রওনা দিয়ে দুপুরে পৌঁছে তোমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে’

আফরোজা বেগম হেসে উঠলেন। সাথে হক সাহেবও। জিনিয়া হাসতে হাসতে আনন্দে হেলে দুলে অন্য ঘরে চলল। জিসান ততক্ষণে স্কুল থেকে ফিরেছে। বাসায় অন্যরকম আনন্দ আবহাওয়া বিরাজ করছে। কালকের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। রাত পোহালেই রওনা।

শুক্রবার সকালে বেশ আগেভাগেই যাত্রা শুরু করল সবাই। কালো রঙের মাইক্রোবাসের ভিতরে জিসান জিনিয়া আর ওদের বাবা মা। হক মামা সামনে। ড্রাইভারের পাশের সিটে। সবাই বেশ উৎফুল্ল, ফুরফুরে মেজাজে। জিনিয়া উশখুশ করছে কিছু বলার জন্য। ভয়ে মুখ খুলছে না। জমানো কথাগুলো গলা পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে। তারপরও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মামার দিকে তাকিয়ে বলল

'আমরা এখন কোথায়'?

'চলছে গাড়ি যাত্রাবাড়ি'

'যাত্রাবাড়ি! এই জায়গার নাম যাত্রাবাড়ি হি হি'

'কেন তোর কোনো সন্দেহ আছে?

'তার মানে এখান থেকে সবাই বাড়ি যাত্রা করে?

'খারাপ বলিসনি, হতেও পারে'

'এই যে শুরু হলো বকবক, জিনিয়া চুপ করবি? তোর যদি এতই নাম জানতে ইচ্ছে করে আশপাশের সাইনবোর্ড দেখে নে। একে ওকে এত জিজ্ঞেস করার কি হলো?' আফরোজা বেগম বেশ কড়া ভাষায় বললেন। জিনিয়া মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে 'রেড সিগন্যাল' পেয়ে কথায় ব্রেক কষল। জিনিয়া মুখে লাগাম টানলেও তার বাবা পিছন থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন 'আশপাশের আরেকটা জায়গার নাম কিন্তু সাইনবোর্ড, গুলিয়ে ফেলো না'

মহিউদ্দীন সাহেবের মন্তব্য শুনে আফরোজা বেগম তেলে বেগুনে জ্বলে রেগে উঠলেন 'একি তুমিও দেখি জ্ঞান দেয়া শুরু করেছ?

পরিস্থিতি বুঝে জিনিয়া বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করল। তবে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইলিশ, ইলিশ, দেখো ইলিশ বাস'।

'কি বাজে বকছিশ, এখানে ইলিশ মাছ কোথায়। ইলিশ তো মাওয়া গেলে পাবি'? আফরোজা বেগমের মুখে এখনো রাগের ঝাঁঝ লেগে আছে।

'ইলিশ মাছ না মা, বাস ঐ দেখো লেখা জিনিয়া বাইরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে বলল। জিসানও লক্ষ করে বলল যে 'হ্যাঁ তাই তো, বাসের নাম ইলিশ'

মহিউদ্দীন সাহেব হো হো শব্দে হেসে উঠল। বাবাকে অনেকদিন পর এভাবে হাসতে দেখে জিসান জিনিয়া দুজনই অবাক! হাসির রেশ টেনে মহিউদ্দীন সাহেব বলে উঠলেন 'ইলিশ একটি বাসের নাম...হা হা, সাইনবোর্ড একটি জায়গার নাম..হা হা হা

আফরোজা বেগম ভ্রু কুচকে মহিউদ্দীন সাহেবকে লক্ষ করে বললেন 'তুমিও দেখছি ওদের সাথে তাল দিচ্ছ। আবার নিজে নিজেই বোকার মতো হাসছ'

টক ঝাল মিষ্টি কথার মাঝে হক মামা বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বার্তা দিলেন 'আমরা এক্সপ্রেসওয়েতে, পদ্মায় পৌঁছাতে বেশি সময় লাগবে না'

হক সাহেবের কথা শুনে সবাই নড়ে চড়ে বসল, একবার বাইরে তাকিয়ে নিল। অসাধারণ দৃশ্য। জিসান জিনিয়ার চোখ চক চক করছে। আফরোজা বেগম আবেগে মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। সাঁই সাঁই মাইক্রোবাস এগিয়ে চলছে। মহিউদ্দীন সাহেব নিজে থেকেই বলে উঠলেন 'বাংলাদেশে এভাবে অনায়াসে যাওয়া যেতে পারে, কেউ কল্পনা করেছে কোনোদিন! একেই বলে এক্সপ্রেসওয়ে'।

জিসান কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল 'এক্সপ্রেসওয়ে কী বাবা?

'তোর সবজান্তা মামাকে জিজ্ঞেস কর?

হক সাহেব ক্লাসে পড়ানোর ভঙ্গিতে বলা শুরু করলেন 'এক্সপ্রেসওয়ে হলো সেই পথ যেখানে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দ্রুত গতিতে গাড়ি চলতে পরে। এ ধরনের রাস্তা আমাদের দেশে এটিই প্রথম, ঢাকা থেকে একদম ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পর্যন্ত, ৫৫ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগবে মাত্র ৪২ মিনিট! ভাবতে পারিস?

গাড়ি সেতুর কাছাকাছি। প্রমত্তা পদ্মা দেখা যাচ্ছে। হক মামা তখনো জ্ঞান আওড়াচ্ছেন 'পদ্মা হলো পৃথিবীর

দ্বিতীয় খরস্রোতা নদী। সবচেয়ে বড়ো খরস্রোতা হলো আমাজান'।

'আমাজান! আমাজান তো অনলাইন মার্কেট মামা, সব কেনাকাটা করা যায়।' জিনিয়া চট করে প্রশ্ন করে বসল।

'এজন্যই বলে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, অল্প বয়সে অল্প বিদ্যা আরও ভয়ংকর, তোকে বলেছি না ওদের বেশি জ্ঞান দিবি না' -আফরোজা বেগম বেশ রাগতস্বরে হক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। ভাইকে বকে মেয়েকে শেখানো আরকি। জিনিয়া এমনিতেই চুপ হয়ে গেল। তবে জিসান মুখ খুলল- 'তাহলে তো মামা এই সেতু তৈরি করতে অনেক কষ্ট হয়েছে'?

'তা তো বটেই। ৬.১৫ কিলোমিটার লম্বা ৪ লেনের সেতু, চাট্টিখানি কথা! তাও আবার পদ্মার বুকে। সড়ক, রেল ও নদীপথের সুবিধা নিয়ে 'ত্রিমাত্রিক' সেতু।

তাই?

'হু, শোন, ৪২টি পিলার বসানো হয়েছে। পিলারের মাঝখানে স্থাপন করতে হয়েছে 'পেন্ডুলাম বিয়ারিং'। যাতে বড়ো ভূমিকম্প মোকাবিলা করতে পারে'।

'কিন্তু এত জোরে গাড়ি চললে তো রাতে ড্রাইভারের দেখতে সমস্যা হতে পারে; দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে'।

'এজন্যই তো এখানে ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্ট আছে। আর ল্যাম্পপোস্টে ১৭৫ ওয়াটের এলইডি বাতি লাগানো। সবগুলো বাতি স্টেডিয়ামে বসালে তো দিবারাত্রির ক্রিকেট ম্যাচ খেলা যাবে'। মামার মুখে রহস্য মিশ্রিত হাসি। হক মামার হাসি জিসানের পরিচিত। এই হাসির অর্থ হলো আরো কোনো ব্যাপার বাকি আছে। জিসান মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বাকি কথা শোনার অপেক্ষায় থাকল। মামা হাসির বিরতির পর বলা শুরু করলেন 'আরেকটা বিষয়, সেতুটা কিন্তু একদম সোজা না। ধনুকের মতো বাঁকা, যাতে ড্রাইভাররা গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকে, হাত স্টিয়ারিংয়ের ওপরে রাখে। অমনোযোগী হয়ে না পড়ে। আবার বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট সরাসরি চালকের চোখে পড়বে না। যাতে দুর্ঘটনা কম হয়।'

'দারুণ ব্যাপার তো' জিসান বলে উঠল।

'আরো দারুণ ব্যাপার হলো সেতুর ওপরে চলবে বাস, ট্রাক, গাড়ি। আর নিচের লেনে রেলগাড়ি'।

'নিচ দিয়ে ট্রেন চলবে কেন মামা। ওপর দিয়ে চলতে পারে না'? জিনিয়া জানতে চাইল।

'পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কঠিন। ট্রেনের মতো বড়ো যানকে ওপরে তুলতে অনেক বেশি ঢাল সামলাতে হবে। তাছাড়া নদীর পানি প্রবাহের উচ্চতাও কমবেশি হতে পারে। এজন্য ট্রেনের পথ নিচে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

জিনিয়া এত ভারি কথা বুঝল বলে মনে হয় না। তবে জিসান জিনিয়ার প্রশ্নবাণ আর হকের তথ্যনির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত কথা ওদের বাবা-মা দুজনই বেশ উপভোগ করছে। ড্রাইভার সাহেবও কান খাড়া রেখেছে। তথ্যগুলো চাক্ষুষ মিলিয়ে নিচ্ছে হয়ত। হঠাৎ জিনিয়া চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাঙ্গা, ভাঙ্গা, সামনে ভাঙ্গা!'

সবাই হকচকিয়ে জিনিয়ার দিকে তাকালো। হক মামা পিছন দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এত সুন্দর রাস্তায় তুই ভাঙা কোথায় পেলি?'

'কেন ওই তো সাইনবোর্ডে লেখা-সামনে ভাঙ্গা, মা তো বলেছিল সাইনবোর্ড দেখতে'।

জিনিয়ার কথা শুনে সবাই একসাথে হেসে ফেলল। হক সাহেব শিক্ষক সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, সবকিছু নাম দিয়ে বিচার করা যায় নারে পাগলি। সামনের ওই জায়গাটার নাম ভাঙ্গা হলেও এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর নান্দনিক নকশার পথ, দেখলেই বুঝবি'। ❑

প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বই পড়ি

মিজানুর রহমান গ্রামসি

বই পড়ি, বই পড়ি, পড়ি বই
খুশিমনে, ক্ষণে ক্ষণে ধরি বই।
ছবি তাও, কবিতাও তাতে থাকে
বই মোর, সই মোর হাতে থাকে।
ছড়া থাকে, ভরা থাকে গল্পেও
মজা পাই, পড়ে তা-ই অল্পেও।
কই সবে, বই হবে সঙ্গী
জ্ঞান পাবো নাহি হবো জঙ্গি।

বইয়ের কথা

রানাকুমার সিংহ

দুই মলাটের ভেতর থাকে জ্ঞানের সাগর-নদী
বুকের মাঝে যায় বয়ে বই নিত্য নিরবধি।
বইয়ের বিশাল জগত থাকে অক্ষরে-অক্ষরে
বই পড়ে কেউ প্রয়োজনে কেউ পড়ে শখ করে।
বই আমাদের বন্ধু এবং আলোর সহযাত্রী
সেই আলোতে দূর হয়ে যায় মন-ভুবনের রাত্রি।
ফারসি ভাষার 'কিতাব' এবং রাশিয়াতে 'নিগি'
আরবিতে বই 'কুতিব' জেনো 'বুক' পড়ে যায় দিঘি।
তুর্কীতে বই 'কিতাপ'ই হয় 'পুস্তাকিন' তো হিন্দি
জাপানিরা 'হোন' বলে আর চায়নাতে কী 'মীন দি'?
চায়নাতে বই 'তুশু' এবং 'লিব্রি' ইতালিতে
ভিয়েতনামে 'সাচ্' বলে তা নাও জেনে নয় ফ্রি-তে।
মালে নামের দেশে 'বুকু' জার্মানিতে 'বাচ্'-ই
বই পড়ি তাই মনের সুখে জ্ঞানের আলোয় বাঁচি!
বই হয়ে যাক দিনযাপনে সবার প্রিয় সাথী
বই নিয়ে তাই এসো সবাই হুল্লোড়ে আজ মাতি !

বই

মো. কামরুজ্জামান

বই পড়ে পাই যে আমরা
হরেক রকম জ্ঞান
বইয়ের মাঝেই পাই খুঁজে
অজানার সন্ধান।

বইয়ের পাতায় হারিয়ে গিয়ে
করি কত ধ্যান।
বইকে ঘিরেই হোক আমাদের
হাসি-কান্নার স্নান।

বই পড়ো, বই পড়ো
বলেছেন গুণিজন
বই পড়েই জীবন গড়ব
এই হোক আমাদের পণ।

শিউলি বনে শরৎ হাসে

শাহীনুর রহমান রিয়াদ

শরত এলে মেঘবলাকা মেঘের কোলে ভাসে
ধলেশ্বরী-পদ্মা পাড়ে কাশফুলেরা হাসে।
হাওয়ার ঢেউয়ে জলপ্রপাতে জলপায়রা নাচে,
শীতলক্ষ্যায় পড়ল ধরা মস্ত বোয়াল মাছে!

শরৎ শিশির ঘাস ফড়িং ও শস্যভরা মাঠে
মাল্লা-মাঝি ভিড়ায় নৌকা গঙ্গা-সদর ঘাটে।
শরৎ এলে শিউলি বনে মিষ্টি মধুর হাসি
দূর বাতাসে ভেসে আসে রাখালিয়া বাঁশি।

এ শরতের বাদলা মেঘের লুকোচুরি খেলায়
দুষ্টুরা সব দলবেঁধে ভাসে কলার ভেলায়।
শরৎ মেঘের হাসি দেখে বাতাস বাজায় বাঁশি
উঠোন জুড়ে গল্প শোনায় আমার পিসি মাসি।

তিন চাকার সাইকেল

জিশান মাহমুদ

ওই দেখো ভাই কে বাজাচ্ছে
টুংটাং টুংটাং বেল
এতো দেখছি রাসেল সোনার
তিন চাকার সাইকেল।
বাড়ির সামনে ছোট্ট লেনে
খেলতো রাসেল হেসে
ইচ্ছে ডানার ভেলায় যেত
মেঘ পরীদের দেশে।
উঠোন জুড়ে ঘুরে ঘুরে
খেলতো সবার সাথে
সকল খেলা পণ্ড হলো
একটি কাল রাতে।
ঘাতক বেশে হায়েনারা
বুকে চালায় গুলি
সোনার মতন মুখটি তোমার
কেমন করে ভুলি।

সুকুমার রায়

সালাম ফারুক

ছড়াগুলো মিষ্টি,
ছন্দের ইষ্টি
অন্ত্যেতে মিল খুবই শক্ত;
আহা কত শব্দ
সাক্ষাৎ জব্দ
সাহিত্যে তার কোটি ভক্ত।

লেখা অনবদ্য,
গল্প-গদ্য
চঞ্চল এ মন তারই মিত্র;
রচনাতে হাস্য
হয়তো ভাষ্য
ঠিক যেন বিশ্বেরই চিত্র।

বলো দেখি নামটা
চাও তো আমটা,
ভুল হলে খাবে তা হংস;
সুকুমারই লিখত
উত্তর ঠিক তো,
টাইটেলে ছিল রায় বংশ।

গল্প

প্রেরণা ও সূর্যমুখীর গল্প

শিবুকান্তি দাশ

ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। বাগানের ফুল কলিরাও ফুটি ফুটি। রক্তজবার সবকটা কলির পরাগ মেলে হেসে উঠেছে। পাশের শিউলি ফুলের কলির পরাগ মেলে হেসে উঠেছে। সূর্যমুখীটা ফুটতেই চায় না। সূর্যের দিকে মুখ করে আছে। কলাবতি ফুলের পাতার ফাঁকে টুনটুনির বাসা। পুব আকাশে আগুনের মতো লাল হয়ে আছে সূর্য। টুনটুনির বাসায় দুটো ছানা। হঠাৎ ফুড়ুত করে মা পাখিটি ডানা মেলল। এসব কিছু ছোট্ট প্রেরণা বাগানের একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে ছিল।

যতই দেখছিল ফুল ফোটার দৃশ্য প্রেরণা ততই অবাক হয়ে উঠছে। ক্লাসে অনিমা ম্যাডাম পড়ানোর সময় বলেছিল, তোমরা কি দেখেছো বাগানের ফুল কীভাবে ফোটে। ক্লাসের কেউ জবার দিতে পারেনি। ম্যাডাম তখন বলছিল, ফুল ফোটা দেখতে হলে ভোরের আলো ফোটার আগে বাগানে যেতে হবে। ফুলেরা কথাও বলে কিন্তু। ওদেরও মা বাবা ভাই আছে।

অবাক হয়ে প্রেরণা ম্যাডামকে প্রশ্ন করেছিল, ওরা কি খায় ?

জবাবে ম্যাডাম বলেছিল সূর্যের আলো ও বাতাস-পানি।

সত্যি তো তাই। প্রেরণা অবাক হয়ে যায়।

রক্তজবার ফুলগুলো সবাই যখন ফুটেছে, মনে হচ্ছে যেন বাগানে কেউ অনেক লাল রং ঢেলে দিয়েছে।

অনেক ফুলের মাঝে দুটো ফুল একটু বড়ো। প্রেরণা ঠিক ধরেছে। ওরা রক্তজবা ফুলের মা-বাবা। অবাকই

তো। বড়ো রক্তজবা দুটোর একটি সূর্যমুখী ফুলকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কীরে ফুটিস না কেন ? সকাল তো হয়ে গেলো। মুখ নিচু করে আছিস ক্যান?

কলাবতী ফুলও ডেকে উঠল, হে সূর্যমুখী অনেক বেলা হয়ে গেল বলে। বাগানের মালিক এসে দেখলে কী ভাববে ?

এখনো তো সূর্য মাথা উচু করেনি। পৃথিবী আলোকিত হলে কি হবে ? সূর্যমুখী জবাব দেয়।

ও মা। ফুলেরা কি বলছে এসব। প্রেরণা অবাকের পর অবাক হয়ে যাচ্ছে। তখন প্রেরণার মনে পড়ে, ম্যাডাম সূর্যমুখী ফুলের কথা বলেছিল। সুর্য যতই আকাশের ওপরে উঠবে, লোকজন তাদের মাথার উপর দেখবে সূর্যকে, ঠিক তখনই সূর্যমুখী ফুল তার সব পরাগ মেলে ডানা মেলবে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করবে।

এক জোড়া প্রজাপতি নাচতে নাচতে পাতাবাহারের একটা ডালে গিয়ে বসল। সেখান থেকে রক্তজবা ফুলের উপর। ফুলের মধু পান করে দুটো একসাথে গিয়ে বসল সূর্যমুখী ফুলের উপর। তখনই রেগে উঠল সূর্যমুখী। আমাকে একটু সময় দাও। আমি তো ফুটিনি এখনো। আমার সব পরাগ না মেললে মধু পাবে কি করে ?

সূর্যমুখীর কথা শুনে প্রজাপতি দুটো উড়ে গিয়ে বসল কলাবতী ফুলের উপর।

এদিকে বাবা-মা প্রেরণাকে বিছানায় না দেখে এ রুম ও রুম, খুঁজতে খুঁজতে বাগানে পৌছে। দেখে প্রেরণাকে। ওরা পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে মেয়ের কাণ্ড। এক পা দুই পা করে সূর্যমুখী ফুলের কাছে গিয়ে বলল, হে সুর্যমুখী তুমি বকলে কেন প্রজাপতিকে ? তুমি তো আলসে মেয়ে। সব ফুল ফুটে আছে তবু তুমি ফোটোনি। প্রজাপতিদের খিদে লাগেনি ? ওরা তো তোমাদের মধু না খেলে নাস্তা করবে কি দিয়ে ?

মেয়ের কাণ্ড দেখে হিহি করে হেসে উঠে বাবা-মা। পেছন ফিরে বাবা-মাকে দেখে প্রেরণাও হেসে হেসে বলল, সব ফুল আমার মতো আগে আগে উঠে গেছে ডানা মেলে। সূর্যমুখী ফুলটা না আলসে! ওর ঘুম ভাঙেনা অনেক বেলা হলেও। ওকে তোমরা আচ্ছা মতো বকে দাও তো বাপি।

আচ্ছা আচ্ছা। এখন চলো তোমারও তো নাস্তা করার সময় হয়ে গেছে। বাবা এ কথা বলে প্রেরণার হাত ধরে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

অনুবাদ গল্প

বালু এবং পাথর

সাইদুল হাসান

জন এবং জেমস্ ছিল খুবই ভালো বন্ধু। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো কিন্তু কখনোই তারা কেউ কাউকে ছেড়ে যায়নি। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল অটল। তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরত চাকরি পাওয়ার জন্য যার মাধ্যমে তারা অর্থ উপার্জন করবে। গ্রাম, শহর, বনবনানি, সাগর চষে বেড়াত চাকরির সন্ধানে। তাছাড়া পুরো ভ্রমণে ওরা একে-অপরকে সহযোগিতা করত এবং সমর্থনও ছিল প্রতিটি সিদ্ধান্তে।

চলতে চলতে একদিন তারা মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তাদের সাথে তখন খুবই অল্প পরিমাণ খাবার ও পানি ছিল। যার কারণে জন তার বন্ধু জেমস্‌কে বলে, তাদের উচিত খাবার ও পানি কম ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যাতে তারা পরে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু জেমস্ তার বন্ধু জনের প্রস্তাবে রাজি ছিল না। কারণ সে ছিল খুবই তৃষ্ণার্ত। তাই সে পানি পান করতে চাইল। মতপার্থক্য থাকার

কারণে পানি নিয়ে তাদের ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। রাগে ফুঁসে জন তার বন্ধু জেমস্‌ের গালে চড় বসিয়ে দেয় এবং তারা দুজনই নীরবে যে যার মতো হাঁটতে থাকে। জেমস্ বালুর বুকে আঙুল দিয়ে লিখল, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি আমাকে চড় দিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি সাগরের তীরে এসে পৌঁছায়। দীর্ঘ পথচলার পর পানির দেখা পেয়ে তারা তো বেজায় খুশি। পানিতে একে-অপরের সাথে হাসি-তামাশা, মজা করছিল। যখন তারা পানিতে গোসল করছিল তখন জেমস্ তার অসাবধানতার কারণে পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম। জন তা দেখতে পেয়ে দ্রুত জেমস্‌ের কাছে গিয়ে তাকে উদ্ধার করল।

জেমস্ তার বন্ধু জনকে বুকে টেনে নিলো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো শীঘ্রই মরুভূমি ত্যাগ করবে। যখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো মরুভূমি ছেড়ে চলে যাবে, তখন জন দেখল তার বন্ধু জেমস্ একটি পাথরে কিছু একটা লিখছে।

যা ছিল 'আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

জেমস্ জনকে বলে, তুমি যখন আমাকে চড় মেরেছিলে তখন আমি সেটা বালুর মাঝে লিখেছিলাম। যা বাতাসে লেখাটি বালুর বুকে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যখন আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে সেটা আমি পাথরের বুকে লিখেছি। যে লেখাটি আজীবন পাথরে গেথে থাকবে।

নীতিকথা: আমাদের উচিত আমাদের মাঝের সকল খারাপ কাজগুলো ভুলে গিয়ে ভালো কাজগুলো সবসময় মনে রাখা এবং সেগুলো হৃদয়ে ধারণ করা। ❑

গল্পকার

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

ত্রয়োদশ পর্ব [শেষ অংশ]

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দশ-বারো মিনিট পরেই পশ্চিম দিক থেকে গাড়ি আসার শব্দ পাওয়া গেল। আমিও রেডি। কিছুক্ষণ পর বড়ো বড়ো দুটো আর্মি-গাড়ি ব্রিজ বরাবর এসে থামল। দুইজন সৈন্য নেমে পাহারাদার সৈন্যদের সাথে দুই-একটা কথা বলল। তারপর ব্রিজের উপর উঠে গেল গাড়ি নিয়ে। সামান্য দূরে আরও কয়েকটা গাড়ি আসছে বলে মনে হলো।

আর্মির গাড়ি দুটো ব্রিজের মাঝ বরাবর পার হয়ে এসেছে। ওদিকে আরও একটা সৈন্য-বোঝাই গাড়ি এসে উঠল ব্রিজের পশ্চিম মাথায়। আমি আর দেরি করা ঠিক মনে করলাম না। মুহূর্তে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম তারের মাথায়।

কয়েক সেকেন্ড নাকি কয়েক মিনিট পার হয়েছে, জানি না। হঠাৎ সে কী আকাশ-ফাটানো আওয়াজ! কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। আমি এক নজর দেখলাম, ব্রিজটা যেন দেশলাইয়ের বাক্সের মতো উপরে লাফিয়ে উঠল। আমি আর ওদিকে তাকাইনি। দৌড় দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম আমার বাহিনীর কাছে। ওরা ততক্ষণে ফায়ার শুরু করে দিয়েছে। গ্রেনেডের শব্দও পেলাম কয়েকটা। এরমধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের খুশি যেন ধরে না। আমি ইশারায় ওদের বললাম– চুপ! এখন খুশির সময় না। ফায়ার চালু রাখো। এই কথা বলে আমি ক্রলিং করে ব্রিজের কাছাকাছি চলে গেলাম।

আমি আমার পজিশনে বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ব্রিজটার অর্ধেকেরও বেশি অংশ ভেঙে পড়ে গেছে নদীর মধ্যে। শত্রুপক্ষের কোনো সাড়া নেই। কোনো গাড়ি বা পাহারাদার সৈন্য কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আমি তখন পিছনে সরে এসে আমার লোকদের ইশারা দিলাম সামনে এগোতে। সাবধানে এগিয়ে আমরা ব্রিজের একেবারে পুব পাশের মাথায় চলে এলাম।

তবে তখনও আমরা ক্রলিং অবস্থায়ই আছি, উঠে দাঁড়াচ্ছি না। বলা তো যায় না– শত্রু যদি আচমকা গুলি করে বসে!

আমরা দেখতে পেলাম, যেসব হানাদার সৈন্য আর রাজাকার ব্রিজের পুব মাথায় পাহারা দিচ্ছিল, তারা সবাই খতম হয়ে গেছে।

এতসব ঘটনার মধ্যে কখন যে ভোর হয়ে গেছে, তা খেয়াল করিনি। আমরা দেখতে পেলাম– ব্রিজের পশ্চিম পাড়েও অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে। কোনো গাড়ি বা জ্যান্ত মানুষের নামগন্ধ নেই। তখন অন্য সবাইকে পজিশনে থাকতে বলে আমি, কদম আলি, বাবর আলি আর আনোয়ার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম ভাঙা-ব্রিজের আরও কাছে। দাদুভাইয়েরা, কী দেখলাম শুনবা?

আমরা রাগে খেকিয়ে উঠি। বলি– নাটকের ক্লাইমেক্সে এসে এভাবে কেউ কোনো প্রশ্ন করে? তুমি যে কী দাদা! যাক, কী দেখলে বলো।

– দাদুভাইয়েরা, যা দেখলাম তা বড়ো ভয়ংকর। দেখলাম, সৈন্যভর্তি আর্মির তিনটে গাড়িই পানির মধ্যে পড়েছে। ভাঙা-ব্রিজের বিশাল খণ্ডের ফাঁকে আটকে আছে, তাই পুরোটা ডোবেনি পানিতে। দেখলাম, একেবারে দুমড়ানো-মুচড়ানো মানে কেরাসিন অবস্থা গাড়িগুলোর! আমাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ভাঙা-ব্রিজের চাঙের তলায় চাপা পড়ে সব পাকিস্তানি সৈন্যই গাড়ির মধ্যে মারা পড়েছে। একটাও গাড়ির বাইরে আসতে পারেনি।

– তারপর কি হলো?

– আকাশের পুব দিগন্ত ফর্সা হয়ে যাওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি সরে আসার জন্য আমি সবাইকে নির্দেশ দিলাম। আমরা পুব দিকে হাঁটা শুরু করব এমন সময় আমি বললাম– সবাই আছে তো? রওশন ভাই, দেখুন তো আপনাদের সবাই অক্ষত আছে কিনা? সাইদ, কদম আলি, আতিক– তোমরাও দেখ। একটু যেন খালি-খালি লাগছে– কে কে যেন নেই, এমন মনে হচ্ছে আমার। বুকটাও কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে...।

আমার কথা শেষ না-হতেই কদম আলি বলে– কমান্ডার স্যার, আমাদের দলের মতিন আর মোকসেদকে এখানে দেখা যাচ্ছে না...তার কথার মধ্যেই রওশন বাহিনীর গুপ্তচর সুমন বলে– আমাদের দলেরও দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না... মানে, তারা এখানে নেই– খালেদ আর আদম। দু' গ্রুপের মোট পঞ্চাশজনের দলে এখন আমরা আছি ছেচল্লিশজন– চারজন কম।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে– কোথায় গেল? কী হলো ওদের? রওশন ভাইও দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুব দিগন্ত আরও ফর্সা হয়ে আসছে। যশোর শহরের এত কাছে বেশিক্ষণ থাকা মোটেই নিরাপদ নয় জেনেও আমি নির্দেশ দিলাম– দ্রুত খোঁজ লাগাও। ঝোপঝাড়, নদীর পাড়ের খাদে সব জায়গায় খোঁজ করো। কুইক!

ততক্ষণে গ্রামের মানুষেরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। তারা আকাশ-ফাটানো জয়বাংলা ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে তুলছে। তাদের অনেকে আমাদের জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল। তারা তাদের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যেতে চাইল। খাওয়াদাওয়া করাতে চাইল। কিন্তু আমাদের চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাওয়া যাচ্ছে না জানতে পেরে তারাও আমাদের সাথে লেগে গেল খোঁজাখুঁজিতে। অল্পক্ষণ পরে চারজনকেই পাওয়া গেল– তিনজনকে ঝোপের মধ্যে তাদের পজিশনে, আর একজনকে নদীর ঢালু বরাবর। সবাই মৃত। সবারই মাথা আর বুকে গুলি লেগেছে। ধারণা হয়, গুলি লাগার পরপরই তারা শহিদ হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে যেন মিষ্টি হাসির আভা ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা ধরাধরি করে ওদের সরিয়ে আনলাম, গ্রামের মানুষেরাও একাজে সাহায্য করল।

বড়ো আম বাগানে এসে আমরা থামলাম। দাইতলার যুদ্ধে যারা শহিদ হলো, তারা হচ্ছে: রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর মতিন আর মোকসেদ, এবং রওশন বাহিনীর খালেদ আর আদম। গ্রামের মানুষদের বিশেষ অনুরোধে বড়ো আম বাগানেই তাদের কবর হলো। শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই গ্রামের নতুন নাম হলো শহিদ নগর। এ গ্রামের আরও তিন যোদ্ধা এর আগে শহিদ হয়েছে, আর এখন ভিন গাঁয়ের চার বীর সন্তানের শেষ আশ্রয় হলো এখানে। তাই গাঁয়ের

এই নাম– শহিদ নগর। নতুন শহিদদের জানাজা পড়িয়েছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম মৌলবি ইমারত আলি, তারও দুই ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছে। তিনি জানাজা নামাজের আগে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, যার কিছুটা আমার এখনো মনে আছে। তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন: 'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।' তিনি আরও বলেছিলেন: মুক্তিযোদ্ধারা ন্যায়পথে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে; সুতরাং তারা আল্লাহর পথেই আছে। আর সেই যুদ্ধে যারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা শহিদ।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের দাফনকাফনের পর গ্রামবাসীরা আমাদের খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। আমাদের যুদ্ধজয়ে তাদের চোখে-মুখে সেদিন সে-কী খুশির ঢেউ! আজও সে-দৃশ্য আমার চোখে ভাসে। অন্য আরো অনেক যুদ্ধেও আমি এমনটা দেখেছি। জানো দাদু ভাইয়েরা, মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামের মানুষের বাড়িগুলোই ছিল আমাদের ঘাঁটি–আমাদের নিরাপদ শেলটার। সেই যে বঙ্গবন্ধু তাঁর সাতই মার্চের ভাষণে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার হুকুম দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই বাঙালিরা তাদের বাড়িগুলোকে যেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। এক-একটা অপারেশন শেষ হলে আমরা ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ হয়ে মানুষের বাড়িতে থাকতাম। কী বলব দাদুভাইয়েরা! গ্রামের এইসব মানুষ আমাদের জন্যে কী যে কষ্ট করেছে! নিজেরা না-খেয়ে আমাদের খেতে দিয়েছে। শীতের মধ্যে নিজেরা গোয়ালঘরে শুয়ে আমাদের জন্য ঘর ছেড়ে দিয়েছে। বালিশ, লেপ এসব দিয়েছে।... ওদের দানের কথা কোনোদিন ভোলা যাবে না। ওদের সাহায্য না পেলে আমরা দেশের মধ্যে টিকতেই পারতাম না, যুদ্ধে জেতা তো পরের কথা। মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক গণমানুষের এমন বিপুল অংশগ্রহণের কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধও বলা হয়ে থাকে।

–তা ঠিক দাদু। তো, পাকি আর্মিরা এরপর কি করল?

–সে-এক মজার ঘটনা। আর্মিরা কিন্তু আর এদিকে আসেইনি। ওদের সৈন্য আর গাড়িরও কোনো খোঁজ করেনি। আসলে ব্যাটারা এত ভয় পেয়েছিল যে, এদিকে আর আসতে সাহস করেনি। ব্রিজও আর মেরামত করতে পারেনি। তাছাড়া, এসব করার সময়ই বা পাবে কোথায় ওরা? বাংলাদেশ ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হলেও যশোর স্বাধীন হয় ডিসেম্বরের ৭ তারিখে। আর আমরা দাইতলা ব্রিজ উড়িয়ে দিলাম পয়লা কিংবা দোসরা ডিসেম্বর। তাই ওরা জান বাঁচাবে, না দাইতলার খোঁজ নেবে! কথায় আছে না– চাচা, আপন জান বাঁচা?

আমি এবার প্রশ্ন করি: গাড়িতে কতজন আর্মি ছিল, তা কি জানা যায়নি? তা ছাড়া এখনকার ব্রিজটাই বা কবে বানানো হলো?

দাদাভাই মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলেন– হ্যাঁ, কয়দিন পরেই তো যশোর স্বাধীন হয়ে গেল। পুরো যশোর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। কয়েক দিন পর শহর থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসলো। বড়ো বড়ো ক্রেন আসলো। গ্রামের মানুষেরাও সাহায্য করল। ভাঙা ব্রিজের চাঙ সরিয়ে গাড়িগুলো কিনারে আনা হলো। ভাইরে ভাই, কী বলব তোমাদের! গাড়ির মধ্যে পাকিস্তানি আর্মিগুলো মরে একেবারে গাদা হয়ে পড়ে আছে। গুনে দেখা গেল, তিনটে গাড়িতে মোট দেড়শ পাকিস্তানি আর্মির লাশ। আর গুলিতে মারা পড়েছে তিরিশ জন, তারমধ্যে বেশকিছু রাজাকারও আছে। সবমিলে ওদের মারা পড়ল ১৮০ জন, আর আমাদের পক্ষে মাত্র চারজন, যাদের কথা আগেই বলেছি। যুদ্ধে আমরাই জিতলাম। আর কদিন পর তো পুরো দেশটাই স্বাধীন হয়ে গেল। ন্যায় ও সত্য কখনো পরাজিত হয় না, তা আরো একবার প্রমাণিত হলো । ডিয়ার দাদুভাইয়েরা, বুঝলে কিছু?

আমরা বললাম– হুঁ, কিছু বুঝেছি। আরও অনেককিছু বাকি আছে, বড়ো হয়ে আমরা সেটুকুও বুঝে যাবো, যেমন তুমি বুঝেছিলে ১৯৭১ সালে– মুক্তিযুদ্ধের সময়। তা দাদা, এখনকার এই ব্রিজটার কথা...।

–হ্যাঁ রে দাদভাইু, সেটাই এখন বলব। ভাঙা ব্রিজের সামান্য দক্ষিণে নতুন এই ব্রিজটা বানানো হয় ১৯৭২ সালে। দেশ স্বাধীনের পরপরই। তবে আমার কাছে আসল দাইতলার ব্রিজ ওইটা, যেটা আমি ডিনামাইট চার্জ করে নিজ হাতে ধ্বংস করেছিলাম। ওই ব্রিজটা ধ্বংস করতে না পারলে তো আমরা শেষ হয়ে যেতাম। তাই ওই ব্রিজই আমাদের জয়ের নায়ক। আমি এখনো ওই পথে যখন বাসে যশোর যাতায়াত করি, ব্রিজের ভাঙা অংশগুলো দেখতে পাই। ওই ভাঙা ব্রিজের অংশগুলো যেন আমার দিকে তাকিয়ে ক্যামন দাঁত বের করে হাসে! যতবার দেখি ততবারই তাই মনে হয় আমার কাছে।

তো দাদু ভাইয়েরা, এই হলো রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনি। এরমধ্যে আরও কত যে ছোটোখাটো কথা ও কাহিনি আছে, কত ছোটো ছোটো স্মৃতি আছে তার শেষ নেই। সব কথা, সবার কথা সেভাবে খুটিয়ে-খুটিয়ে বলতে পারলাম না। অনেক নাম এরইমধ্যে ভুলেও গেছি। কারণ, সময় তো কম হলো না– প্রায় পঞ্চাশ বছর! তবে তাদের বীরত্ব, সাহস আর দেশপ্রেমের কথা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না।

তবে দাদুরা, একটা কথা মনে রাখবা: সারা বাংলাদেশের গোটা মুক্তিযুদ্ধ ছিল অনেক বড়ো, অনেক ব্যাপক। অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা যেমন এই দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছেন, তেমনি অনেক ভারী ভারী অস্ত্রও ব্যবহার হয়েছে গোটা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে। এই যুদ্ধে আমাদের বন্ধুদেশ ভারতের সশস্ত্রবাহিনী আমাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। তারপরও আমি বলব: মুক্তিযুদ্ধে রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর যে অবদান, তাকেও ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সারাদেশে এমন শত শত গেরিলা বাহিনী দেশের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে লড়াই করেছে, তাদের মেরুদণ্ড আর মনোবল ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে; অনেকে শহিদ হয়েছে, অনেকে বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরেছে। এভাবে সবার চেষ্টা ও আত্মদানে সম্ভব হয়েছে চূড়ান্ত বিজয়, জন্ম নিয়েছে এক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ– বাংলাদেশ। ❑

শিশুসাহিত্যিক

আমাদের দায়িত্বই শিশুদের অধিকার

মো. বেলায়েত হোসেন

আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই। এমন সাজানো বাগান তৈরির দায়িত্ব পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের। এরই প্রেক্ষিতে শিশুর অধিকার, সুরক্ষা এবং শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন করার লক্ষ্যে 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২রা অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস এবং ২ থেকে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে। আজকের শিশুরাই আগামীর জাতির কর্ণধার। সুতরাং শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি বলে দিবে দেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে। উন্নত দেশগুলো শিশুদের বিষয়ে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করেছে। উন্নয়নশীল, দরিদ্র দেশগুলো তাদের পথিকৃৎ।

প্রত্যেক শিশু পৃথিবীতে কিছু অধিকার নিয়ে ভূমিষ্ট হয়। তার দেখাশোনা, বেড়ে উঠার নিরাপদ পরিবেশ, মানসিক বিকাশে সহযোগিতা, শিক্ষার অমৃত স্বাদের সুযোগ সৃষ্টি; এসব তার জন্মগত অধিকার। অন্যদিকে, এসব অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং যেগুলো আমাদের দায়িত্ব, সেগুলো একটি শিশুর অধিকার। একটি শিশুর মানসিক বিকাশে যত বেশি সুযোগ পায়, তার কাছ থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি সুফল পেতে পারে। শিশুর প্রথম পাঠশালা তার পরিবার তথা মা। মায়ের মুখ থেকে শোনা শব্দেই তার মুখে ধ্বনিত হয় অ আ ক খ। সেক্ষেত্রে একটি পরিবার তথা একজন সচেতন ও শিক্ষিত মা একটি শিশুকে মানবিক, আদর্শ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মূল কারিগর। এটি অন্য কারো মাধ্যমে শতভাগ কখনোই সম্ভব নয়।

জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত শিশুদের কল্যাণে এবং অধিকার রক্ষায় সরকার প্রণীত শিশু আইন- ২০১৩ এর ৪নং ধারায় বলা হয়েছে ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে। ধারা ৭ এ জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড, ১৬ এ শিশু আদালতসহ আইনটিতে বিদ্যমান সর্বমোট ১০০ (একশত) টি ধারার মাধ্যমে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশু নীতি- ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিশু দিবাকেন্দ্র আইন- ২০২১, শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন, নারী ও শিশুদের জন্য হেল্পলাইন ১০৯ চালু, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান,পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম, সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুদের জন্য জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিদ্যালয়ে

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুকরণ, বছরের প্রথম দিন শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ শিশুদের জন্য সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন- ২০২০-এর মাধ্যমে শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ এর ৩৫ নং ধারা, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি-২০১০ এবং বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন- ২০১৮-এর মাধ্যমে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এর শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ২-এর ২.১ এ শিশুদের জন্য সারাবছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ২.২ এ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূর করার কথা বলা হয়েছে। অভীষ্ট ৩-এর ৩.২ এ ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুহার হ্রাস করতে বলা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) গৃহীত অভিষ্টের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের বিকাশের বাধা ৩৬.১% থেকে ২৫% এ নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ২৮%। অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের কম ওজনের মাত্রা ৩২.৬% থেকে ২০% নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে ২০১৯ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ২২.৬%। অনূর্ধ্ব ৫বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৭এ নামিয়ে আনার কথা থাকলেও ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন ২৮। কোভিড মহামারির ভয়াবহতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অর্জন অন্যান্য দেশের জন্য অনুসরণীয়। (তথ্যসূত্র: জিইডি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন)

উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস তৈরিতে আছে অনেক চ্যালেঞ্জ। অসচেতনতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কিশোর অপরাধের চিত্র, শিশু শ্রম, কিশোর গ্যাংসহ অন্যান্য অপরাধ আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে যারা পথশিশু রয়েছে তাদের নিয়ে এক শ্রেণির দুষ্টু মানুষের অপরাধ কর্মকাণ্ড ভাবিয়ে তোলে। শিশুদের বিকাশে খেলার জায়গায় তৈরি হচ্ছে বিশাল অট্টালিকা। ঘর বন্দি হচ্ছে শিশুরা। অভিভাবকরা হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে দায় সারা। এতে মোবাইল আসক্তি, মাদকাসক্তি, একাকীত্ব শিশুকে বিভিন্ন অপরাধের দিকে ধাবিত করে। নৈতিকতা শেখার প্রথম এবং একমাত্র স্থান হচ্ছে পরিবার।

শিশুকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলা পরিবারের দায়িত্ব। শিশুকে পরিবারের মা-বাবা যথেষ্ট সময় দেওয়াই শিশুকে বিভিন্ন অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে। খেলাধুলা, সুস্থ ধারার বিনোদনে শিশুদের সম্পৃক্ততা বহু অপরাধ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে পারে। সরকারি যেসব আইনকানুন রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে সকলের সচেতনতা এবং 'শিশুর প্রতি হ্যাঁ' স্লোগানই শিশুদের মানসিক বিকাশ ও অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। ❑

সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অফিস, রামগড়, খাগড়াছড়ি

বিশ্বের অজানা সুন্দর প্রাণী

মো. রফিকুল ইসলাম

এই বিশ্বের সব প্রাণীই সুন্দর। কিন্তু এমন কিছু প্রাণী রয়েছে, যাদের নিয়ে পশুপ্রেমীদের মধ্যেও চর্চা হয় খুব কম। সুন্দর অথচ কম আলোচনায় থাকা এমনই পাঁচটি প্রাণীর হদিস তোমাদের জন্য।

প্যাঙ্গোলিন

আঁশযুক্ত শরীর বনজঙ্গলে চলাফেরা করা রুই মাছের মতো দেখতে Pangolin বা বনরুই। এরা বিপদের আভাস পেলে নিজের শরীর গুটিয়ে নেয় বলে মালয় ভাষায় এদের বলা হয় 'পেঙ্গুলিং' - যেখান থেকে এসেছে এদের ইংরেজি নাম প্যাঙ্গোলিন। বিশ্বের

একমাত্র দাঁতহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। পিঁপড়াজাতীয় প্রাণী খায় বলে আঁশযুক্ত পিঁপড়াভুক নামেও পরিচিত। বনরুই এশিয়া মহাদেশ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। পৃথিবীতে ৭ প্রজাতির বনরুই রয়েছে। এশীয় বনরুইদের ৩ প্রজাতিই বাংলাদেশে দেখা যায়।

প্লাটিপাস

পৃথিবীতে এমন প্রাণীও আছে, যা স্তন্যপায়ী হয়েও বাচ্চা প্রসব করে না (স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে); ডিম পাড়ে এবং ওই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এ রকমই একটি স্তন্যপায়ী কিন্তু উভচর প্রাণী হলো প্লাটিপাস। এটি নিশাচর প্রাণী। দেহের রং বাদামি প্রকৃতির, লোমশ দেহ এবং প্রশস্ত ও সমান্তরাল লেজ

রয়েছে। পায়ের আঙুলের মাঝখানে চামড়া থাকার ফলে এটি ভালো সাঁতার কাটতে পারে। সাঁতারের সময় চোখ বন্ধ রাখে প্লাটিপাস। তখন শ্রবণ, স্পর্শ ও বিদ্যুতায়িত তরঙ্গ ব্যবহার করে চলাচল করে। নাক বেশ বড়ো এবং রাবারের মতো। হাঁসের ঠোঁটের মতো দেখতে বলে এটি হংসচঞ্চু নামেও পরিচিত।

প্রধান খাদ্য- কেঁচো, পোকামাকড়ের ডিম, স্বাদু পানির চিংড়ি ইত্যাদি। লম্বায় দেহ হয় ১২ থেকে ১৬ ইঞ্চি আর লেজ ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি। পানি থেকে অল্প উঁচুতে ডিম পাড়ার প্রায় দশ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা জন্মায়। বাচ্চাকে এরা স্তন্য পান করায়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চাগুলোর লোম জন্মে এবং চলাফেরা করতে শুরু করে।

মিরক্যাট

বেজি জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। মিরক্যাটরা সামাজিক প্রাণী এবং গোত্রে বসবাস করে। এদের একটি দলে প্রায় ২০ থেকে ৫০টি মিরক্যাট থাকতে পারে। এরা দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বন্য পরিবেশে মিরক্যাটরা গর্তে বসবাস করে। দিনের বেলা খাবার খোঁজার সময়ই কেবল এরা গর্ত থেকে বের হয়। যখন খাবার সংগ্রহের জন্য বের হয় তখন দলের একজনকে পাহারায় রাখে যাতে করে শিকারী প্রাণীর আগমনের আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া যায়। খাদ্য সংগ্রহের জন্য এরা কয়েক সেকেন্ডের

মধ্যেই এদের উচ্চতারও বেশি গভীরে মাটি খুঁড়তে পারে। মিরক্যাটরা মূলত পতঙ্গভোজী তবে সাপ, গিরগিটি, মাকড়সা, বিভিন্ন প্রাণীর ডিম এবং গাছপালাও এদের খাদ্য তালিকায় থাকে।

লেমুর

'লেমুর' শব্দের অর্থ মন্দ, প্রেত মৃতের ল্যাটিন শব্দ lemurs থেকে লেমুর শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ ভূতের মতো। রাতের আঁধারে লেমুরের মুখে আলো ফেললে অনেকটা ভূতের মতো দেখায় তাই এর নামকরণ এভাবে করা হয়েছে। মাদাগাস্কারের প্রাইমেট গোত্রভুক্ত কিছু প্রাণীর সমষ্টিগত নাম। এই প্রজাতিটি খুব সম্ভবত সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে মাদাগাস্কারে আবির্ভূত হয়েছিল। লেমুরের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আচরণের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত

সবচেয়ে স্বীকৃত প্রজাতি হলো রিং-লেজযুক্ত লেমুর। ক্ষুদ্র বাদামি প্রাণী, কক্ষের মতো চোখ আর শিয়াল সংকীর্ণ মুখের মতো লেমুরের। কান পয়েন্ট এবং একটি ছোটো, আর্দ্র নাক রয়েছে। তাদের আঙুলগুলি গাছ এবং ফলকে আঁকড়ে ধরার জন্য এবং তীক্ষ্ম নখর গাছগুলিতে আরোহণে সহায়তা করে। গাছ এবং শাখাগুলির ছিদ্র থেকে গর্ত করতে দীর্ঘ ও প্রেনেসাইল আঙুলটি ব্যবহার করে। লেমুররা ফলভোজী প্রাণী হলেও এদের খাদ্য তালিকায় কীটপতঙ্গ থাকে।

ওকাপি

মধ্য আফ্রিকার দেশ কঙ্গো। এখানকার গহিন অরণ্যে দেখা পাবে আজব এক প্রাণীর। নাম ওকাপি। সামনের পা আর শরীরের পেছনের অংশে সাদা-কালো ডোরা। দেখে অনেকেই ভাবে এরা বুঝি জেব্রার আত্মীয়। কিন্তু জেব্রার সঙ্গে সম্পর্ক নেই ওকাপিদের। মাথার দিকে ভালোভাবে তাকাও। জিরাফের সঙ্গে মিল পাচ্ছ? এরাই পৃথিবীতে জিরাফের একমাত্র আত্মীয়।

জিরাফের মতো দেখতে হলেও আকারে বেশ ছোটো। এরা জোড়া ক্ষুরবিশিষ্ট তৃণভোজী প্রাণী। গায়ের রং বাদামি। লেজের কাছে ও পেছনের পায়ে সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ আছে। জেব্রার মতো। দেহের তুলনায় গলা লম্বা জিরাফের মতো অতটা নয়। তবে জিভটা অনেক লম্বা। এতই লম্বা যে এটা দিয়ে ওকাপিরা নিজেদের কানের ভেতর-বাইর দুটোই পরিষ্কার করতে

পারে অনায়াসে। আঠালো জিভ দিয়ে সহজেই উঁচু ডালের কচি পাতাসহ ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখা মুখের ভেতর টেনে নিতে অসুবিধা হয় না। জিরাফের মতো মাথার গড়ন, কান বড়ো আর খাড়া।

গায়েগতরে বেশ বড়ো হয় ওকাপি। কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা ৫-৬ ফুট। দৈর্ঘ্য কমসে কম ৭-৮ ফুট। শুধু তাই নয়, পুরুষ ওকাপির মাথার ওপরে জিরাফের দুটি শিঙের মতো ১.৫ সেন্টিমিটার উপবৃদ্ধি দেখা যায়। বড়ো কানের ওকাপিদের শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যার কারণে বিপদের কোনো সম্ভাবনা দেখলেই গাছপালা ও লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। এরা খুব লাজুক। গরুর মতো খেয়ে অবসরে জাবর কাটে। এরা গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর জাতীয় প্রাণী।

প্রাচীনযুগের পাখি

এখন কয়েকটি মাত্র বেঁচে আছে।

বিচিত্র এই পাখির মাথাটি দেখতে ঠিক হাঁসের মতো দৈহিক আকার-আকৃতি এবং ওজনের দিক থেকে অন্য প্রাণী থেকে অনেক বড়ো। ওজন প্রায় ছয় কিলো। পাখিটির নাম শুবিল। পক্ষিবিশারদরা উনিশ শতকের দিকে এর ত্বক নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন, প্রাচীন মিশর ও আরবীয় দেশগুলোতে বহুকাল আগে থেকেই প্রাণীটির অস্তিত্ব ছিল। গোটা বিশ্বে এখন ১৯৮টি শুবিল জীবিত।

শুবিল আফ্রিকার সবচেয়ে অদ্ভুত এবং লম্বা পাখি। এরা প্রায় ৫ ফুট লম্বা। বেশিরভাগ সময়ে মিঠাপানিতে মাছ এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ শিকার করে সময় কাটায়। শিকার ধরতে এরা সিদ্ধহস্ত। এই শান্ত প্রকৃতির পাখিকে কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায় না। তবে বসবাসের জন্য জঙ্গলের প্রায় ৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে। এদের ওজন প্রায় ৪-৭ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

শুবিলের সবচেয়ে অসামান্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বিশাল ঠোঁট যা দৈর্ঘ্যে ২৪ সেন্টিমিটারে পৌঁছাতে পারে। এর ঠোঁট বড়ো মাছ ধরতে এবং ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী এটি মানুষের উপস্থিতিতে লাজুকপাখি। খাদ্য প্রধানত মাছ যদিও এটি অন্যান্য জলজ প্রাণী যেমন- ব্যাঙ সরীসৃপ এবং ছোটো জলপাখিকেও শিকার করে। জলের কাছাকাছি ঘন গাছপালার উপরে বাসা তৈরি করে। একটি বড়ো, নীল-সবুজ ডিম দেয়। ছানা ফুটে উঠলে, মা-বাবা যে মাছ ধরেন তা তাকে খাওয়ায়। যেহেতু একবারে শুধুমাত্র একটি ছানা বড়ো করে, তাই

প্রজাতির স্থায়ীত্বের জন্য ছানাটির বেঁচে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বেশ দীর্ঘজীবী, ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বাঁচতে সক্ষম। ❑

প্রাবন্ধিক

শিশুর বিকাশে গাছ

গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড দূর করে। মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বারান্দায় বা ঘরে গাছ রাখলে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। তেমনি বাড়িতে থাকা শিশুর বেড়ে ওঠাতেও এই বিশুদ্ধ বাতাস ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। শিশুর বিকাশে গাছ সরাসরি সাহায্য করে–এমনটি দাবি করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 'ইউরোপিয়ান রেসপিরেটরি জার্নাল'। তারা জন্মের পর ১০ বছর পর্যন্ত ৩২০০ শিশুকে নিয়ে চালানো গবেষণায় জানতে পারে, আশপাশে সবুজ থাকলে শারীরিক ও মানসিকভাবে শিশুরা ভীষণভাবে উপকৃত হয় ।

তাই আমরা শহরে কিংবা গ্রামে বেড়ে ওঠা শিশুদের মানসিক বিকাশে গাছ বিষয়ক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে পারি–

- ❑ যেসব শিশুর বাড়িতে গাছ বেশি, তাদের ফুসফুস অন্যদের থেকে ভালো থাকে।
- ❑ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে গাছের যত্ন নিলে শিশুও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।
- ❑ ছাদে, বারান্দায় বা বাগানে বিভিন্ন সবজি ফলাতে পারি। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে গাছ থেকে সবজি উঠিয়ে রান্না করলে নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আরো বাড়বে প্রকৃতির প্রতি শিশুর ভালোবাসা।
- ❑ শিশুকে বাড়িতে ফলানো শাকসবজিগুলোর পুষ্টিগুণ জানালে তার জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- ❑ গাছের সার তৈরি, ফল সংগ্রহ ইত্যাদিতে নিয়োজিত রাখলে শিশুর ভালো সময় কাটবে ও বিভিন্ন গ্যাজেটের প্রতি আসক্তি কমবে।

তবে শিশুদের দিয়ে গাছ লাগানো ও পরিচর্যায় কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে–

- ❑ কীটনাশক বা রাসায়নিক সার শিশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- ❑ নিড়ানি বা ধারালো কিছু শিশুর হাতে দেওয়া যাবে না। এগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। ❑

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

সঞ্চয়ী পাখি

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখে। শুধু পশু পাখি নয়, এই জগতের প্রত্যেকটা প্রাণী নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে জানে। মানুষ যেমন অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করে রাখে তেমন অন্যান্য পশু পাখিও অল্প অল্প করে খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করতে চায়। সম্প্রতি তেমনই একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে দুরন্ত গতিতে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যায়, এক পাখি নিজের ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছে এবং সেই পাখির সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ দেখে চক্ষু চরক গাছ সকলের।

একটি কাঠঠোকরা পাখি এতটাই খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছে, যেন মনে হচ্ছে পরজন্মে এসে সেই খাবার সে আবার খাবে। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। যে বাড়িতে পাখিটি খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছিল সেই বাড়ির মালিক দেওয়াল থেকে ৩১৭ কেজি ফল সংগ্রহ করেছে।

বাড়ির মালিক একদিন দেওয়াল থেকে এরকম ছোটো ছোটো দানা বেরিয়ে আসতে দেখে তখনই পেস্ট কন্ট্রোল কর্মীদের খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে আসেন পেস্ট কন্ট্রোল কর্মী। এরপর বাড়ির দেয়াল থেকে উদ্ধার করা হয় শতাধিক ছোটো ছোটো ফল।

ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সাথে সাথে ভাইরাল হয়ে যায়। ছবিটি দেখে নেটিজেনরা অবাক হয়ে যান, কীভাবে একটি পাখি এত খাদ্য জমিয়ে রেখেছে অল্প অল্প করে।

পাখিটি কতটা পরিশ্রম করে এই ফল জমিয়েছিল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। একদিকে যেমন একদল পাখিটির কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করছে তেমন অন্যদিকে অনেকেই বাড়ির মালিককেও সাপোর্ট করেছেন। এই ফল যদি বেশিদিন থাকত তাহলে যে-কোনো সময় বাড়ি ভেঙে পড়ত বলে আশঙ্কা করছিল। ❑

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

টিম অ্যাটলাসের স্বর্ণপদক

বহুতল ভবনের ১৮ তলার মাঝখানের কোনো এক রুমে আগুন লেগেছে। এতবড়ো ভবনের কোথায় আগুন লেগেছে তা খুঁজে বের করতেই অনেক সময় লেগে যায়। দ্রুত দুর্ঘটনাস্থল খুঁজে বের করার চিন্তা মাথায় রেখে রোবট আবিষ্কার করেছে আমাদের খুদে বিজ্ঞানীরা।

আগুনের উৎস খুঁজে বের করে তা দ্রুত নেভানোর চেষ্টা করে এমন রোবট উদ্ভাবন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণপদক জয় করেছে বাংলাদেশের তরুণ রোবোটিক দল 'টিম অ্যাটলাস।' মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ইনভেনশন কম্পিটিশন অ্যান্ড এক্সিবিশনে' এ পুরস্কার জিতে নেন বাংলাদেশের তরুণরা। প্রতিযোগিতায় তাদের উদ্ভাবিত 'ফায়ার ডিফেন্ডার' আইটি অ্যান্ড রোবোটিকস বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

যৌথভাবে এ এক্সিবিশনের আয়োজন করে মালয়েশিয়ার মাহশা ইউনিভার্সিটি ও ইন্দোনেশিয়া ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। হাইব্রিড মডেলে এই এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হয়। তাদের উদ্ভাবিত ফায়ার ডিফেন্ডার সরাসরি আগুনের উৎস খুঁজে বের করে তা দ্রুত নেভানোর চেষ্টা করতে সক্ষম। স্বয়ংক্রিয় এবং রিমোট দুই ভাবেই এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ফায়ার ডিফেন্ডার রোবট আগুনে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণও পৌঁছে দিতে সক্ষম।

এছাড়া দুর্ঘটনাপূর্ণ বদ্ধ জায়গা থেকে কার্বন মনোক্সাইডযুক্ত বিষাক্ত ধোঁয়া টিউবের মাধ্যমে বাইরে বের করে দিতে রোবটটিতে যুক্ত আছে স্মোক ভ্যাকুয়াম। এটি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে নির্মিত এবং প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাজ করতে সক্ষম। পুরস্কারজয়ী রোবট ফায়ার ডিফেন্ডার উদ্ভাবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০ জন শিক্ষার্থী টিম অ্যাটলাসে দলবদ্ধভাবে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক সাইফুল ইসলাম।

২২-২৬শে সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এক্সিবিশনে ২০ দেশের চার শতাধিক টিম অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তারা। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়া টিম অ্যাটলাসের সদস্যরা হলেন- সানি জুবায়ের (ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি), শিহাব আহমেদ (নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি), ফাহিম শাহরিয়ার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মেহরাব ইসলাম (ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি) ও মেহরান ইসলাম (বিএএফ শাহীন কলেজ)। অন্যদিকে অনলাইনে টিম অ্যাটলাস দলকে সহযোগিতা করেছেন সাকিবুল আহসান (ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি) ও সানজিদা সিদ্দিকা (মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ)। ❑

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

শান্তির বার্তা নিয়ে ৫২ বিদেশি বাংলাদেশে

শান্তির বার্তা নিয়ে দুই হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ সাইকেল চালিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন ৫২ বিদেশি নাগরিক। বাংলাদেশের গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ও ভারতের স্নেহালয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে যুব শান্তি শিবিরে (ইয়ুথ পিস ক্যাম্প) যোগ দিতে তাঁরা নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী আসেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারতের মহারাষ্ট্রের আহম্মেদনগর থেকে সাইকেল চালিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে আসেন।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে অনুষ্ঠিত যুব শান্তি শিবিরে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্যসহ ১২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ৫২ সদস্যের এই দলে ভারতের মহারাষ্ট্র, ওডিশা, কেরালা, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রদেশের ৫০ জন নাগরিক ও ২ জন ব্রিটিশ নাগরিক আসেন বাংলাদেশে।

২২শে সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। দলটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তারা ২৬শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পদ্মা নদী ও সেতু ঘুরে দেখেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে এসে শান্তি শিবিরে যোগ দেন।

শান্তি শিবিরে যোগ দিতে আসা দলে ১৪ বছরের কিশোর হতে ৭০ বছরের বয়স্ক নাগরিকও রয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন নারী সদস্য। তারা একসঙ্গে ৩৬ জন সাইকেল চালান। কেউ ক্লান্ত হয়ে পরলে তিনি গাড়িতে বসে বিশ্রাম নেন। ৫০ জন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে বাংলাদেশে আসা ব্রিটিশ নাগরিক নিকুলাকস পকস ও তার স্ত্রী লরেন হজও সাইকেল চালিয়ে বাংলাদেশের পথ প্রান্তর ঘুরে দেখেছেন। দলের সঙ্গে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের একটি মেডিকেল দল ও একটি পথপ্রদর্শক দল ছিল।

সাইকেল চালিয়ে তাদের বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কাছ থেকে দেখা। এই টিমের সদস্যরা চলার পথে বিভিন্ন জায়গায় সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়েছেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করে স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য গান গেয়ে শোনান। তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা পেয়েছেন।

তারুণ্যের শক্তিতে অহিংসার মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য সাইকেল যাত্রা। ওই দলটি ৩রা অক্টোবর ঢাকায় মতবিনিময় করে ৫ই অক্টোবর ভারতে ফিরে যায়। ❑

প্রতিবেদন : নাজমুল কবীর

শিশু-কিশোরদের বাতজ্বর

পাঁচ থেকে ১৫ বছর বয়সি শিশুদের গলা ব্যথা সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করানো উচিত। এতে বাতজ্বর হওয়া থেকে শিশুরা রক্ষা পাবে।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের স্ট্রেপটোকক্কাস নামক এক ধরনের বিশেষ শ্রেণির জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। এর কারণে গলা ব্যথা, গিরা ব্যথা ও জ্বর হয় - যা বাতজ্বর নামে পরিচিত। সাধারণত এসব উপসর্গের চার বা পাঁচ সপ্তাহ পর বাতজ্বর দেখা দেয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে কোনো চিকিৎসা না দিলেও মনে হয় যেন সেরে গেছে এবং কিছুদিন পর আবার দেখা দেয়।

গ্রুপ 'এ' ব্যাকটেরিয়া হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে গলা ব্যথার পর ইমিউন প্রক্রিয়ায় হার্ট ও বিভিন্ন জয়েন্টে, কখনো বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, চামড়া বা শরীরের অন্যান্য অংশের ক্ষতিসাধন হয়। তবে গলা ব্যথা হলেই বাতজ্বর হবে এমন ভাবা ঠিক নয়। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাসের কারণে গলা ব্যথা হয়ে থাকে। সাধারণ নিয়মে যে গলা ব্যথায় নাক ঝরে না, চোখ ঝরে না বা লাল হয় না, তার কারণ স্ট্রেপটো ব্যাকটেরিয়া।

এছাড়া স্ট্রেপটো গলা ব্যথায় গলার পাশের গ্ল্যান্ড কিছুটা বড়ো পাওয়া যেতে পারে, যা ধরলে ব্যথা অনুভূত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য গলা ব্যথা নাও থাকতে পারে।

সাধারণত পাঁচ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের বাতজ্বর হয়ে থাকে। তবে এই বয়সসীমার চেয়ে বড়ো অথবা ছোটোদেরও এ রোগ হতে পারে।

ঘিঞ্জি, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে থাকা শিশুদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তবে বয়স ও পরিবেশের প্রভাবের বাইরে জেনেটিক কারণও আছে। একবার এ রোগ হলে বার বার এটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিশুদের বাইরে শিক্ষক, শিশুপরিচর্যাকারী ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এ রোগে ভোগার ঝুঁকি থাকে। বিভিন্ন কারণে বাতজ্বর হতে পারে যেমন

হৃদযন্ত্রের প্রদাহ (কার্ডাইটিস) : শিশুদের বাতজ্বরে সবচেয়ে মারাত্মক অসুবিধা এটি, যা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে হতে পারে।

এর ফলে যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে সেগুলো হচ্ছে– শ্বাসকষ্ট হওয়া, বুক ধড়ফড় করা এবং পায়ের পাতা ফুলে যাওয়া, কখনো বা কোনোরূপ উপসর্গ ছাড়া অনেকটা গোপন ধরনের কার্ডাইটিসে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।

গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া (আর্থ্রাইটিস) : ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বাতজ্বরের শিশুর এ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সচরাচর দু-দিকের একই প্রকারের বড়ো বড়ো অস্থিসন্ধি যেমন -পায়ের গোড়ালি, হাঁটু, কনুই, হাতের কনুই, হাতের কবজির গিরা ফুলে যায়। এছাড়া আরো বহু রোগের কারণে শিশুদের গিরায় ব্যথা বা ফোলা দেখা যায়।

লক্ষণ : বাতজ্বরে জয়েন্টের ব্যথা এতটা বেশি থাকে যে শিশু তা স্পর্শ করতে দিতে চায় না। এক গিরার ব্যথা কমে এলে অন্য একটি গিরায় ব্যথার পরিমাণ বেড়ে যায়। কোনো চিকিৎসা না পেলেও দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে গিরা ব্যথা ও ফোলা নিজে নিজেই সেরে যায়। শিশুকে অ্যাসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ খাওয়ানোর ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গিরা ব্যথা ও ফোলার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। সে কারণে শিশুর গিরা ব্যথা বা গিরা ফোলা দেখা দিলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানোর আগে অ্যাসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ শিশুকে খাওয়ানো উচিত নয়।

নিয়ন্ত্রণহীন অঙ্গ সঞ্চালন (কোরিয়া), চামড়ার নিচে ছোটো ছোটো গুটি হওয়ার লক্ষণ (সাবকিউটেনিয়াস নডিউল), শরীরের বিভিন্ন অংশে লালচে দাগ (ইরিথেমা মার্জিনেটাম) থাকলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে শিশুটি বাতজ্বরে ভুগছে। বাতজ্বর হলে সচরাচর বেশি মাত্রায় বা তীব্র জ্বর হয় না।

চিকিৎসা: শিশুর বাতজ্বর হলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া উচিত। ❑

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

কাজী আসির আবরার সত্য, চতুর্থ শ্রেণি, ঢাকা অ্যাডভান্টিস প্রি-সেমিনারি স্কুল, ডেমরা, ঢাকা

ঘড়ির কাঁটা উলটো ঘোরা গ্রাম

আধুনিক ঘড়ির আবিষ্কার হয় ইউরোপে। আজ থেকে প্রায় ৭০০ বছর আগে। তারও আগে সূর্য ঘড়ি ব্যবহার করত মিশরীয়রা। আবিষ্কারের পর থেকেই ঘড়ি বাম থেকে ডান দিকে ঘুরে সময় বলে দেয়। আর যদি ডান থেকে বামে ঘোরে তাহলে তা হবে উলটো। আর এমনি এক ঘটনা ঘটেছে স্লোভাকিয়ায় অবস্থিত ভ্রাবেলে। এ গ্রামটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যা দেখে মনে হবে যেন ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরছে। সম্প্রতি 'প্লস ওয়ান' নামে এক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রামটিতে রয়েছে অদ্ভুত একটি বৈশিষ্ট্য। গ্রামের বাড়িগুলো একটু একটু করে বাঁ দিক ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। প্রথম বাড়ির পর দ্বিতীয় যে বাড়ি তৈরি হয়েছে সেটি সমান ভাবে না করে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে তৈরি করা। ঠিক তেমনই তৃতীয় বাড়ি আবার দ্বিতীয় বাড়ির থেকেও একটু বাঁ দিক ঘেঁষা। এ ভাবেই গ্রামের সমস্ত বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা অনুমান করেছেন, ডান দিক দিয়ে জোরে আসা বাতাসের গতি থেকে রক্ষা পেতে সামান্য বাঁ দিক ঘেঁষে বানানো হয়েছিল বাড়িগুলো।

অনেকের মতে, সূর্যের আলো পেতেই প্রথম বাড়ির বাঁ দিকে দ্বিতীয় বাড়ি বানানো হয়েছিল। প্রকৃত কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত কারণ বোঝানোর জন্য 'সিউডোনেগলেক্ট' শব্দটি ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা জানান, বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। মানুষকে কোনো লাইনের মাঝখান চিহ্নিত করতে দিলে, তারা যে বিন্দু নির্দিষ্ট করে থাকেন, সেটি সামান্য বাঁ দিক ঘেঁষেই হয়ে থাকে। সবটাই আসলে মানুষের মস্তিষ্কের খেলা। এই বিষয়টিই নাকি ঘটেছিল এ গ্রামে। প্রথম বাড়ির সঙ্গে ঠিক পিছনে সমানভাবে দ্বিতীয় বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে মাঝখান স্থির করতে পারা যায়নি। সামান্য বাঁ দিক ঘেঁষে তৈরি হয় দ্বিতীয় বাড়ি। একই ঘটনা ঘটেছিল তৃতীয়, চতুর্থ এবং পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা বাড়িগুলোতে। তবে নতুন নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বর্তমানে এই সমস্যায় আর পড়তে হয়নি। ❑

প্রতিবেদন : সাইফুল ইসলাম

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০শে সেপ্টেম্বরকে পালন করা হয় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য- 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যা শিশুর অধিকার'। এদিকে প্রতিবছরের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শিশু সপ্তাহ পালন করা হয়। এই শিশু সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর পালন করা হয় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস।

সারা বিশ্বেই নানা কারণে কন্যা শিশুরা বেশ অবহেলিত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা, সব দিক থেকেই বলতে গেলে তারা বঞ্চিত। বিশ্বের কোনো না কোনো জায়গায় প্রতি মুহূর্তে অবহেলার শিকার হচ্ছে কন্যা শিশু। পরিবার ছাড়াও সামাজিকভাবেও তারা হচ্ছে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত। সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রসহ সমস্ত স্থানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূরীকরণ হলো কন্যা শিশু দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। গৃহ-পরিবেশে একজন পুত্রসন্তানকে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে আদর-যত্নে লালনপালন ও শিক্ষার প্রতি যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেভাবেই একজন কন্যা শিশুর মানসিক নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করার কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে এ দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু, যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। আর শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যা শিশু, যাদের পিছনে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কন্যা-জায়া-জননীর বাইরেও কন্যা শিশুর বৃহৎ জগৎ রয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ছাড়াও পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এজন্য কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বেড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করাই এ দিবস পালনের সার্থকতা। আর কন্যা শিশু সুরক্ষা পেলে সব বৈষম্য দূর হবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কন্যা শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে।

বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর আইন প্রয়োগসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ । শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশে সফল নেতৃত্বের বিকাশে কন্যা শিশুদের অধিকার রক্ষায় আরো বেশি সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বাণীতে তিনি বলেন, কন্যা শিশুদের জন্য বিনিয়োগ হবে যথার্থ বিনিয়োগ। কারণ আজকের কন্যা শিশুই আগামী দিনে গড়ে তুলতে পারবে একটি শিক্ষিত পরিবার ও বিশ্বসভায় নেতৃত্ব দানে পারদর্শী সুযোগ্য সন্তান। আজকের কন্যা শিশুর মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজ করছে আগামী দিনের আদর্শ মা। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের সফল নেতৃত্বের বিকাশে আমরা কন্যা শিশুদের অধিকার রক্ষায় আরো বেশি সচেষ্ট হব-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

এ দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে কন্যা শিশু। নারী ও কন্যা শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বাংলাদেশ এখন জেন্ডার সমতায় সারা বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, কন্যা শিশুদের বিকশিত হওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহলে তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে এবং আগামীর উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট' বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছরের ১১ই অক্টোবর পালিত হয় আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

নাফিসা তাসনিম স্নেহা, কেজি শ্রেণি, রোজবার্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

শিশুদের হাতে চারাগাছ

গাজীপুরের শ্রীপুরের নিভৃত একটি গ্রাম সাইটালিয়া। এখানে বসবাসকারী মানুষের মূল কর্ম হলো কৃষিকাজ। এ গ্রামেরই একজন বাসিন্দা খলিল মিয়া। খলিল মিয়ার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী। ছোটোবেলা থেকেই খলিল মিয়ার বৃক্ষরোপণ ও তা পরিচর্যার প্রতি ছিল বিশেষ আগ্রহ।

বিভিন্ন পেশার সাথে তিনি যুক্ত থাকলেও কাজের ফাঁকে শ্রম দিয়ে বাড়ির আঙিনায় গড়ে তুলেছেন একটি নার্সারি। সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে গাছের চারা তুলে দেন। এতে তিনি আনন্দ অনুভব করেন। নার্সারির কোনো চারাগাছ তিনি এখন পর্যন্ত বিক্রি করেননি। গত তিন বছরে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও কাপাসিয়া এলাকার ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে খলিল মিয়া প্রায় ১৫ হাজার ফলজ গাছের চারা বিতরণ করেছেন। নিজে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে দেন সকল গাছ। এই শখ তার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি জেলার সব বিদ্যালয়েই পৌঁছে দিতে চান তার নার্সারির চারাগাছ। এর মাধ্যমে বৃক্ষের প্রতি শিশুদের ভালোবাসা বাড়ানোই তার লক্ষ্য।

বীজ বপনের জুতো

জুতো লাগাবে গাছ! অবাক করা খবর তাই না বন্ধুরা? তবে এই জুতোটি গাছ লাগানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি। পরীক্ষাগারে রীতিমতো গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছে এমন পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণের জুতো। আউটসোলের (Aesthetic) ছোটো হুকগুলোতে আটকে শহর ও শহরের বাইরের গাছগুলো থেকে বীজ ছড়িয়ে দিতে পারদর্শী এই বিশেষ জুতো জোড়া। শহুরে পরিবেশে গাছপালার সংখ্যা বাড়াতে দারুণ সহায়তা করতে পারবে এ ধরনের রানিং সু। এ বিশেষ ধরনের জুতোর ডিজাইনার এর নাম কিকি গ্রামাটোপুলস। এই জুতোর ডিজাইন এর ধারণাটি হলো যে, এটি একটি প্রাণীর মতো বনজঙ্গল থেকে দৌড়ানোর সময় বীজ রোপণ করবে এবং সব জায়গায় তা ছড়িয়ে দেবে। যেভাবে একটি বাইসন (Baison) প্রাণী তার শরীরের পশম দিয়ে বীজ ছড়ায় ঠিক সেভাবে। কিকির মতে- বিভার, নেকড়ে বা বাইসনের মতো প্রাণীরা শহুরে পার্কে নিজের বিস্তার ঘটাতে পারে না। প্রাকৃতিকভাবে তাই শহুরে অঞ্চলে গাছপালা বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেই ঘাটতি মেটাতে মানুষকে এই বিশেষ জুতোর মধ্যে পা গলানোর আহ্বান জানিয়েছেন কিকি।

দুই দেশের এক শহর

দুই দেশের এক শহর! নেই কাঁটাতরের বাঁধা। পা বাড়ালেই যাওয়া যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। কারণ এই শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির রেস্তোরাঁ কিংবা কফিশপের মাঝ দিয়ে রয়েছে দুই দেশের সীমানারেখা। ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সীমানায় অবস্থিত অদ্ভুত এই শহরটির নাম BAARLE। মজার ব্যাপার হচ্ছে, BAARLE শহরের বেলজিয়ামের অংশটি পুরোপুরিভাবে নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত। আবার একইভাবে নেদারল্যান্ডসের অংশটি বেলজিয়ামে অবস্থিত। বিচিত্র এই শহরের মানুষেরা ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই যত খুশি ততবার বর্ডার ক্রস করতে পারে। ফলে শহরের অধিবাসীরা এক দেশের নাগরিক হয়েও অন্য দেশের কাজ করতে পারেন। দুই দেশে অবস্থিত হওয়া এই শহরে সবকিছুই দুটি করে। দুই দেশে দুই নামে পরিচিত শহরটি। নেদারল্যান্ডসের অংশের নাম Baarle Hertog আর বেলজিয়ামের অংশের নাম Baarle Nassau। শুধু নামই নয়; শহরের পৌরসভা, মেয়র, পোস্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন সবকিছুই দুটো করে। যদিও সবকিছু পরিচালিত হয় একটি মাত্র কমিটির অধীনে। মূলত মধ্যযুগ থেকে শহরটি এরকম।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ২০১৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় যে দল, ২. শক্তি, ৩. ১০০ বছরের এক সময়কাল, ৬. মানদণ্ড, ৮.একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য ধারা, ৯. দুর্বল, ১০.অসন্তুষ্ট, ১১. যন্ত্রের অংশবিশেষ

উপর-নিচ: ১. বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, ২. ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন, ৪. একটি ভৌত রাশি, যা গরম ও ঠান্ডা পরিমাপ করে, ৫. নৌকা চড়ে বেড়ানো, ৭. যথাযথ, ৮. দুঃসহ কষ্ট

১.				■	২.		
	■	■	■	■		■	■
৩.	৪.		■	■		■	৫.
■		■	■	■	■	■	
■	৬.			৭.	■	■	
৮.		■	■	৯.			
	■	■	■		■	■	■
১০.			■	১১.			

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: আনন্দমেলা, কানন, মেলান্দহ, কালবেলা, আকার, বেখেয়াল, মায়াশালিক, শাক, হর, রস

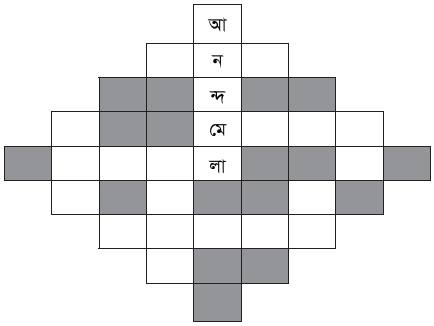

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৮১			৪৪		২৮			২১
৭৮		৪৬		৩০		২৬	২৩	
	৭৬				৩২		২৪	
	৭৫		৪৯	৪০		৩৪		১৮
৭৩		৭১	৫০		৩৮		১৬	
৬৮		৭০		৫২	৩৭	৩৬		১৪
	৬৬		৫৮			১	১২	১১
৬৪		৬০	৫৭		৩	৬		
	৬২			৫৫			৮	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	*		-	৭	=	
+	■	+	■	+	■	-
	/	২	+		=	৪
/	■	-	■	-	■	+
২	*		-	৫	=	
=	■	=	■	=	■	=
	-	১	*			৪

সেপ্টেম্বর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

				ছ	*		অ
	নি	উ	ই	য়	র্ক		ক্টো
দা	ম		উ				ব
			নি		ব	ছ	র
	স্বে	চ্ছা	সে	বী		ত্রা	
আ			ফ		আ	ক	র
কা	ত	ল					সু
শ				স	মা	ধা	ন

ছক মিলাও

				মা				
					সে			
			অ	বি	চ	ল		
		কা		শ্ব		লি		
	চা	প	রা	শি		ত	খ	ত
		ড়		শু	শু	ক		
				দি		লা		
			অ	ব	শ			
				স				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৩	*	৪	-	৬	=	৬
+		*		-		+
২	+	১	-	৩	=	০
-		-		*		+
১	*	২	+	১	=	৩
=		=		=		=
৪	+	২	-	৩		৯

নাম্রিক্স

৭৩	৭৪	৭৫	৪০	৩৯	৩৪	৩৩	২৮	২৭
৭২	৮১	৭৬	৪১	৩৮	৩৫	৩২	২৯	২৬
৭১	৮০	৭৭	৪২	৩৭	৩৬	৩১	৩০	২৫
৭০	৭৯	৭৮	৪৩	৪৪	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৬৬	৬৫	৬৪	৪৫	২০	১	২	৩
৬৮	৬৭	৬২	৬৩	৪৬	১৯	১২	১১	৪
৫৭	৫৮	৬১	৪৮	৪৭	১৮	১৩	১০	৫
৫৬	৫৯	৬০	৪৯	৫০	১৭	১৪	৯	৬
৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১	১৬	১৫	৮	৭

m¤§vbx MÖnY i weÁwß

আগামীতে লেখক সম্মানী ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এজন্য সম্মানিত লেখকগণকে লেখার সাথে ব্যাংক একাউন্টের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা এবং রাউটিং নম্বর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব নম্বর চালু করার অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

রাফিন আল রাজী, প্রথম শ্রেণি, আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

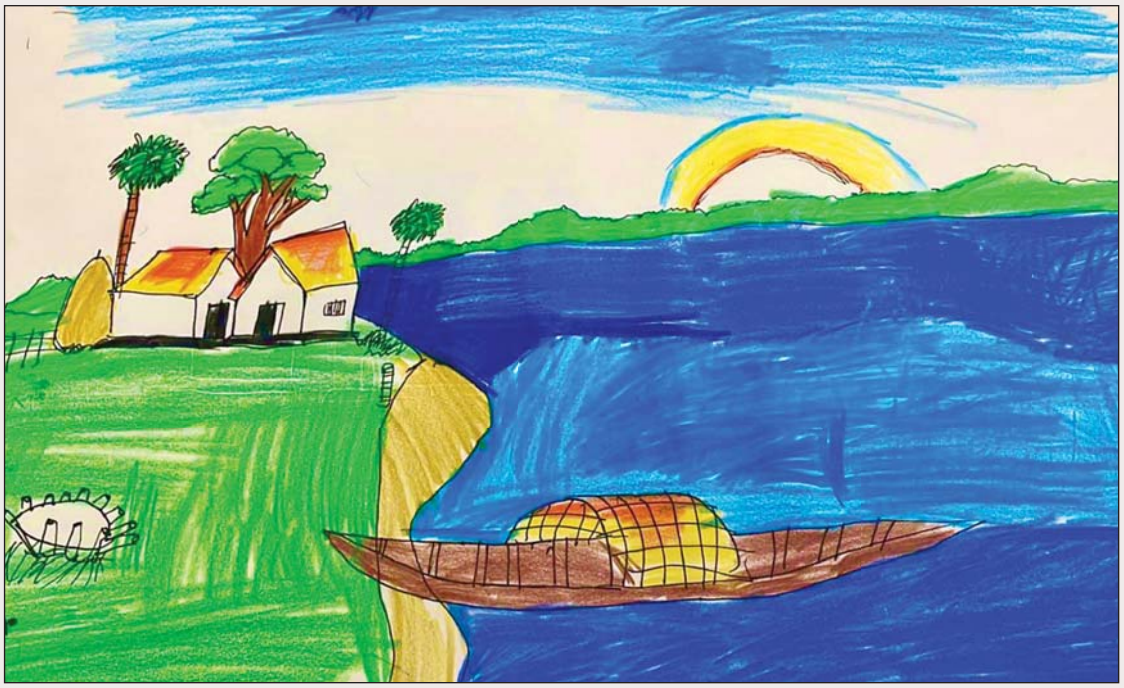

নাভিন আল রাজী, প্রথম শ্রেণি, আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার, প্রথম শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল, ঢাকা

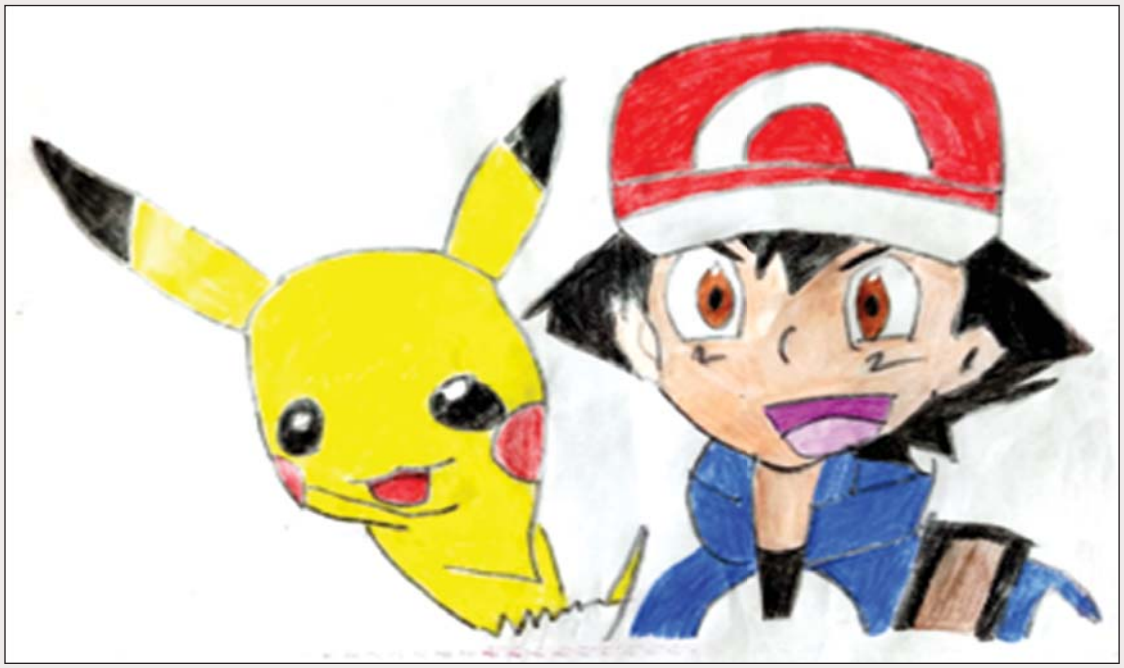

মুয়াজ আজিজ, চতুর্থ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

ইরাম ইনায়া, চতুর্থ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য, অষ্টম শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে

সচেতনতা

- জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ করতে হবে
- চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে
- পানি জমে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র উলটে রাখতে হবে
- ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে
- জানালাতে মশা প্রতিরোধক নেট ব্যবহার করতে হবে
- শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিবারক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে
- মশা নিধনের ওষুধ, স্প্রে কিংবা কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে
- পাতলা কিংবা ঢোলা পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবেন
- শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নিয়ে নিরাপদে রাখবেন

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-04. October 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

সায়েমা আঞ্জুম বিভা, নবম শ্রেণি, আইডিয়াল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা